চিতোরগড়

শ্রীপান্নাবত

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

□ প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭১ / জুলাই ১৯৬৪

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম
১০/২ এ, টেমার লেন কলকাতা-৭০০০০৯

□ মুদ্রাকর : নিমাই চন্দ্র ঘোষ। দি রঘুনাথ প্রিণ্টার্স
৪১ই বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬

□ প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

আমার গুণগ্রাহী পাঠকবর্গকে—

লেখকের কয়েকটি বই :

আরাবল্লী থেকে আগ্রা

মেবার বহ্নি পদ্মিনী

রাণাদিল্ ১৯

রাজপুত নন্দিনী

মমতাজ দুহিতা জাহানারা

সিংহদ্বার

কিতাগড় ১৪

লেফ স্যাণ্ডিং

আমি সিরাজের বেগম

বিনোদিনী ১৭

শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে ১৮

লাভার্স লেন ১৯

আমি আজ নায়িকা ২০

দুর্জয় দুর্গ ২১

এরা তিন জন (ছোটদের) ২২

হারিয়ে যাবার নেই মানা (ছোটদের) ২৩

চিতোরগড়

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। আরাবল্লীর গিরি-কন্দর, বন-উপত্যকা সারাদিনের তপ্ত সূর্যের প্রখর কিরণে ঝল্‌সে পুড়ে একাকার। জল নেই কোথাও। যেখানে যেটুকু তলানি পড়েছিল শুকিয়ে খাঁ খাঁ।

এই নিদারুণ অপরাহ্নে নির্জন উপত্যকার গিরিপথ ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে একাকী চলেছে এক তরুণ! কৈশোরের সীমারেখা সে পার হয়েছে কি হয়নি। দীর্ঘ ঋজু দেহ, ক্ষীণ কটিদেশ, উন্নত বলিষ্ঠ বক্ষ। মাথায় তার পাগড়ী। হাতে বর্শা আর পিঠে তার তীর-ধনুক। রোদে পোড়া মুখমণ্ডল এই বয়সেই হয়ে উঠেছে তামাটে।

কিশোরের অশ্ব ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মুখের ফেনা অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছে। টলতে টলতে কোনরকমে চলেছে সে। দু' চার পা গিয়ে পড়ে যাবে আছড়ে। সে পিপাসার্ত।

তরুণও তৃষ্ণার্ত, কিন্তু সে আদৌ বিচলিত নয় নিজের জন্যে। নিজেকে কতটা কষ্ট দেওয়া যায় সেই পরীক্ষাতেই সে মাঝে মাঝে এইভাবে বার হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ তার বাহনটির অবস্থা দেখে সে চিন্তিত হয়ে ওঠে।

লাফিয়ে নেমে পড়ে ঘোড়ার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে বলে—কষ্ট হচ্ছে তোর। তাই না রে বিজয়? দেখি, জল পাওয়া যায় কিনা। তুই দাঁড়া।

সামনে ঘন অরণ্য। পথ সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ পথে আগে কোনদিন আসেনি। মানুষ এখানে বাস করে বলে মনে হয়নি। শেষ গ্রামখানি বহু আগে পেছনে ফেলে এসেছে। সেই গ্রামেও মাত্র দুই ঘর শিকারীর বাস।

তবু অরণ্য যখন রয়েছে, পানীয়ের সন্ধান মিলতে পারে। তার একটা ধারণা রয়েছে সূর্যকিরণ আর জলই অরণ্যের উৎস। তবে সেই জল পাহাড়ের পাথরের অনেক নীচেও থাকতে পারে।

সে তার অশ্বকে সম্বোধন করে বলে—শোন্ বিজয়, যদি আশ-পাশে জল থাকে আমি আনবই। কিন্তু না থাকলে, তোরও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। গত মাসে দুদিন না খেয়ে ছিলি, মনে আছে? তার আগে একবার

চোট্ খাওয়া পা নিয়ে কতদূর গিয়েছিলি? শেষে জলের জন্য মরবি তুই? খুব কষ্ট হচ্ছে তোর। একটু বিশ্রাম নিলে সেই কষ্ট না-ও থাকতে পারে। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে পারিস? আমি পারি। চেষ্টা করে দেখ লক্ষ্মীটি। পিপাসার কথাও ভুলে যেতে পারিস।

অন্য সময় হলে অশ্বটি মনিবের কথার জবাব দিত কোনরকম শব্দ করে। কিন্তু এখন সে পারে না। সে ধুঁকতে থাকে। তার সুন্দর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো আধ-বোজা। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে কোনরকমে দেহটিকে চারপায়ের ওপর খাড়া রাখার চেষ্টা করে। সে হয়ত জন্মগতভাবে জানে একবার মাটিতে পড়ে গেলে তাদের জাতি আর ওঠে না কখনো।

তরুণ তার অশ্বটির অবস্থা বুঝতে পারে। মন আকুল হয়ে ওঠে। দ্রুত পদে এগিয়ে চলে। হাতে আত্মরক্ষার একমাত্র ভরসা বল্লমটি। সে ভালরকম জানে এইসব অরণ্যে হিংস্র প্রাণীদের বাস।

চারদিকে একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা বিরাজ করছে। অরণ্যও স্তব্ধ। অসংখ্য বৃক্ষরাজির অগুন্তি পাতার একটিতেও চাঞ্চল্য নেই। মনে হচ্ছে, তারা যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটা কিছুর অপেক্ষা করছে। কারও কোন বিপদ ঘটবার অপেক্ষা। আক্রমণ আসবে বোধহয় দুই আগন্তুকের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গাছের শাখা-প্রশাখা দুলে উঠবে, পাতারা নাচতে শুরু করবে। বনের পশুপাখী একসঙ্গে ডেকে উঠবে। তারপর আগন্তুকদ্বয়ের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে গেলে দোদুল ডালপালা শান্ত হবে, পাতার নাচন থেমে যাবে। আবার স্তব্ধতা।

তরুণ এগিয়ে চলে। তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি চারদিকে। বড় বড় গাছের কাণ্ড একে একে অতিক্রম করে। আশেপাশের ঝোপ-ঝাড় তাকে ঠেলে বার করে দিতে চাইছে তাদের রাজত্ব থেকে। তবু দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলে সে। জল চাই। বিজয়কে বাঁচাতে হবে।

হঠাৎ সে থেমে পড়ে। উৎকর্ণ হয়। কিসের একটা সুর শোনা যায় না? সঙ্গীত? না, বোধহয় মনের ভুল। কিংবা সে হয়ত কোন গানের কথা ভাবছিল। সেই গানই মনের ভেতরে সুরের ঝংকার তুলেছিল। নির্জন জায়গায় এমন কতকিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। ঠিক এই ধরনের না হলেও অন্য রকমের অভিজ্ঞতা তার নিজেরও রয়েছে।

আরও একটু এগিয়ে আবার থামে তরুণ। না, মনের ভুল নয়। কে যেন গাইছে। দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। সেই চির নতুন অথচ চির পরিচিত সুর। মায়ের মুখে শুনেছে, যুগের পর

যুগ রাজস্থানের আকাশ-বাতাস এই সুরে ভরে রয়েছে। রাজস্থানের যত সুখ, যত দুঃখ, যত বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই এই সুরের ভেতর দিয়ে ভাষা পায়। চারণ কবির সুর।

কিন্তু কোন্ সেই চারণ কবি যিনি এই শ্বাপদ-সঙ্কুল বনস্থলীর ভেতরে একা একা গেয়ে চলেছেন? এতটুকু প্রাণের মায়া নেই কি তাঁর। কাকেই বা শোনাচ্ছেন? বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীকে? ওরা কি তাঁর কোন ক্ষতি করে না?

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তরুণ এগিয়ে যায়। তার মন থেকে সাময়িকভাবে তৃষ্ণার্ত বিজয়ের কথা মুছে যায়। অথচ সে আনন্দিত হতে পারত এই ভেবে যে মানুষ যখন একজন রয়েছেন তখন পিপাসার জল মিলবে।

এবারে সঙ্গীতের কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হে বীর, তোমার বিহ্বলতা
হটিয়ে দাও
মায়ের চোখের অশ্রুধারা
মুছিয়ে দাও,
রাজপুত জাতি মরিবে না কভু
বুঝিয়ে দাও।
ভুলো নাকো তুমি অতীতের কথা
ভুলিয়া যেওনা সেইসব গাথা—
যে-সব গাথায় অমর রয়েছে
বীরের আত্মদান
সে আত্মদান অহেতুক নয়
রবে চির অম্লান।
আরাবল্লীর পাষাণ-কায়ায়
বৃক্ষলতার প্রতিটি পাতায়
মরু-বালুকার কণায় কণায়
আছে শোণিতের দান।
হে বীর, তোমার স্বপ্ন আবেশ
কাটিয়ে দাও
রোদ-ঝলসানো অসি হাতে তুমি
এগিয়ে যাও।

গানের সুর লক্ষ্য করে পাগলের মত ছুটতে থাকে তরুণ। ভুলে যায় যে সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হতে পারে। ভুলে যায় হিংস্র প্রাণী যে কোন

মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। লতা-গুল্ম, কাঁটা-ঝোপ, গাছের ডালপালা দুহাতে সরিয়ে, দুপায়ে মথিত করে সে ছুটে চলে।

অবশেষে সে আকাঙ্ক্ষিত স্থানটিতে এসে পৌঁছাতে পারে। জায়গাটি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। একটা বিরাট বটবৃক্ষ অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারই নীচে একটি পাথর। সেই পাথরের ওপরে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর সঙ্গীত থেমে গিয়েছিল একটু আগে। দুই চোখ মুদ্রিত অবস্থায় বসে রয়েছেন।

তরুণ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার মনে হয়, বৃদ্ধ গভীর ধ্যানমগ্ন। কিন্তু তাঁকে দেখে সন্ন্যাসী বলে মনে হয় না। হয়ত গানের আবেগে চোখ বন্ধ করে রয়েছেন।

তরুণ অপেক্ষা করে। সে এদিক-ওদিকে চেয়ে জলের সন্ধান পায় না। তবে বুঝতে পারে, জল মিলবে। বিজয়ের কথা আবার তার মনে পড়ে গিয়েছে।

কবি অবশেষে চোখ খোলেন। সামনে তরুণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর চোখে সামান্য একটু বিস্ময় ফুটে ওঠে।

কবি বলেন,—কে তুমি?

—আমি একজন রাজপুত।

কবির মুখে হাসি খেলে যায়। তিনি বলেন,—সেকথা মুখ ফুটে বলে না দিলেও চলে। তোমার চেহারায় সেকথা লেখা রয়েছে। চেহারায় আরও অনেক কিছু লেখা থাকে। তোমারও রয়েছে।

—আপনি কি আমার পরিচয় জানতে চান?

—না থাক। পরিচয় জানার দরকার নেই। উৎসাহ পাই না।

—কিন্তু আপনার গান শুনে তো তেমন মনে হয় না। তাতে উৎসাহ শুধু নয়, অনুপ্রেরণাও রয়েছে।

—বাঃ বেশ বলেছ তো? কম বয়স এত, কিন্তু চমৎকার বুদ্ধি দেখছি।

—আপনার গান শুনে বুকের ভেতরে কেমন করে ওঠে। ঠিক বলে বুঝিয়ে দিতে পারছি না। সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ।

—হ্যাঁ। কিন্তু অমন সবারই হয়। হতে বাধা কোথায়? এ এক ধরনের বিলাসিতা।

—ও কথা বললেন কেন?

—তাছাড়া কি? কি লাভ? এই সঙ্গীত শুনে দেশের জন্যে আত্মদান করতে পার?

তরুণ অবাক হয়ে অতি সহজ কণ্ঠে বলে,—পারব না কেন ?

এবারে কবি জোরে হেসে ওঠেন। হাসিতে তাঁর দুঃখ মাখানো। একটু বিদ্রূপও যেন। বলেন,—অল্প বয়সে আবেগ বড় বেশী থাকে। একটু বয়স হলে দেখবে ওসব কিছু থাকবে না।

তরুণ দৃঢ় স্বরে বলে,—আপনার একথা আমি মানতে পারছি না। অপরাধ নেবেন না। আমার আবেগ শরতের মেঘ নয়।

—তাই নাকি ? তাহলে চিতোরগড এতদিন ধরে অন্যের হাতে পড়ে রয়েছে কেন ?

তরুণের মুখ ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে। অথচ কিছু বলতে পারে না। সত্যিই তো কবির প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। তাঁর কথা যথার্থ।

সে বলে,—আমি জলের খোঁজে এসেছি। আমার অশ্ব পিপাসায় মৃতপ্রায়। অনুগ্রহ করে বলে দিন, কোথায় পাব জল।

কবি একটি জলপাত্র পাশ থেকে টেনে নিয়ে এগিয়ে দিয়ে বলেন,—ওই যে দেখছ অশ্বত্থ গাছ, ওর গোড়ায় পাথরের ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে ক্ষীণ স্রোত ধারা। নিয়ে গিয়ে অশ্বকে বাঁচাও। তোমার এতক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত হয়নি।

তরুণ জলপাত্র নিয়ে ছুটে যায়। কবি তার গমনপথের দিকে চেয়ে ভাবেন, কে এই কিশোর! সুঠাম দেহ, দৃপ্ত ভঙ্গী, স্পষ্ট কথাবার্তা। সাধারণ মানুষ এমন হয় না। কেন এসেছে এই জনমানবহীন অরণ্যে ?

জল নিয়ে অশ্বটির কাছে গিয়ে তরুণ দেখে সে তখনো কোনরকমে নিজেকে সোজা রেখেছে। তখনো ধুঁকছে। তার গায়ে হাত দিয়ে বলে,—জল এনেছি বিজয়। খেয়ে নে। এবারে আরাম হবে। আর ভয় নেই। এটুকু খেয়ে নে আবার আনব।

ঘোড়াটি অতি কষ্টে পান করে। জলপাত্র মুহূর্তেই নিঃশেষ। কিশোর আবার ছোটে। আবার জল নিয়ে আসে।

কয়েকবার এইভাবে জল এনে দিতে ঘোড়াটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণে সূর্য পশ্চিমের পর্বত শিখরের আড়ালে গা-ঢাকা দেয়। এরপরই অন্ধকার নেমে আসবে। সহস্র ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

তরুণ জলপাত্র আর ঘোড়াটিকে নিয়ে চারণ কবির উদ্দেশে রওনা হয়। পাত্রটি ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু দিনের আলো আবছা হয়ে আসছে। কবি কি তার জন্যে একা অপেক্ষা করবেন ? তাঁর রাতের আস্তানা কোথায়

জানা নেই, আশেপাশে কোন আস্তানা তার চোখে পড়েনি। সন্ধ্যা নামলো বলে। তিনি যদি অপেক্ষা না করে চলে যান? তাড়াতাড়ি চলে সে ঘোড়াকে নিয়ে।

দূর থেকে কবিকে একই জায়গায় বসে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয় তরুণ। যেমনটি আগে দেখেছিল, ঠিক তেমনি বসে রয়েছেন। জলপাত্রটি তাঁর সামনে রাখে সে।

তারপর প্রশ্ন করে,—আপনি কোথায় থাকেন?

—এই বনেই।

—এইখানে?

—না। পাশে একটা আস্তানা রয়েছে।

—দেখছি না তো?

—দেখতে পাবে না। যেতে হবে একটুখানি পথ।

—বনে আর কেউ নেই?

—না।

—একা?

—হ্যাঁ।

—হিংস্র পশুর ভয় নেই?

—না। তারা বোধহয় বুঝে ফেলেছে, আমি তাদের কোন ক্ষতি করব না।

—কিন্তু তারা যদি বুঝে ফেলে খিদের সময় খাদ্য হিসাবে আপনি খারাপ নন?

চারণ কবি একটু হাসেন। জবাব দেন না এ-কথার। তরুণ ভাবে, তার বাচালতায় কবি বোধহয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আসলে কিন্তু তা নয়। কবি তার কথার ধরনে আনন্দিত হয়েছেন। ভাবছেন তরুণটি বেশ রুচিশীল।

তরুণের কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বলেন,—আমার জন্যে ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই তোমার। বরং আমার ব্যস্ততা তোমার জন্যে। তুমি এখন কি করবে?

যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছে। পথ শুধু দুর্গম নয়, বিপদ প্রতি পদক্ষেপে। বাড়ী ফিরতে রাত শেষ হয়ে যাবে। তবু মনে মনে ঠিক করেছিল তরুণ সে ফিরে যাবে। কারণ না গিয়ে কোন উপায় নেই।

কবির কথার জবাবে সে বলে,—আমাকে ফিরতে হবে।

—মা হয়ত চিন্তা করবেন। রাত শেষে আমায় না দেখলে তাঁর দুর্ভাবনাও হতে পারে।

—আমার উপদেশ, তুমি রাতের মত থেকে যাও।

—ফিরে যাওয়া কি অসম্ভব?

কবির ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। বলেন,—রাজপুতের জীবনে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এই কথাটা তারা ভুলে গিয়েছে। তবু তোমায় থাকতে বলছি, তোমার বয়স খুব কম বলে। তোমার ঘোড়াটিও পরিশ্রান্ত। রাতের অন্ধকারে তার পা ফসকে যেতে পারে। তাতে অনিবার্য মৃত্যু।

তরুণ একটু সময় ভাবে।

কবি প্রশ্ন করেন,—তুমি এদিকে কেন এসেছিলে? কোন দরকারে?

—না এমনিতে। এভাবে আমি এদিক-ওদিক একা একা যাই। পথঘাট চেনা হয়। নিজের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতারও পরীক্ষা হয়ে যায়।

—তাহলে থেকে যাও রাতের মত। আমার তো মনে হয় না তোমার মা চিন্তা করবেন। যে মা ছেলেকে এভাবে ছেড়ে দেন, তাঁর চিন্তা অতটা ঠুনকো হবে কি?

চারণ কবি ঠিকই ধরেছেন। কতবার এমন হয়েছে। রাতে বাড়ি পৌছাতে পারেনি। মা সেজন্য এতটুকুও চিন্তিত হননি। কোন প্রশ্নও করেননি।

চিতাবাঘের গর্জন শোনা যায় অদূরে। ঘোড়াটি ছটফট করে ওঠে। গাছের ডালে একদল বাঁদর কিচির মিচির করতে থাকে। বনের ভেতরে ইতিমধ্যেই বেশ অন্ধকার।

কিশোর বলে,—আপনার অতীত দিনের কথা শোনাবেন? তাহলে থাকতে পারি।

—নইলে?

—চলে যাব।

—ভয় করবে না?

—মরণের?

—তাছাড়া কি?

—ঠিক বুঝতে পারি না মৃত্যু ভয় কাকে বলে। বুঝলে হয়ত ভয় পেতাম।

চারণ কবির মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। বলেন,—আমার অতীত দিনের কি কথাই রয়েছে। তবে শুনতে চাইলে, চিতোরগড়ের কথা বলতে পারি। ভাল লাগবে তোমার?

—এর চেয়ে ভাল কিছু আছে নাকি ?

তরুণের উৎসাহ দেখে কবি বলেন,—তাই বুঝি ? তবে তো ভালই হল। শোনাব তোমাকে। তার আগে তোমার খাওয়া দরকার। তোমার ঘোড়াও অভুক্ত।

তরুণ মনে মনে পুলকিত হয়। সঙ্গে তার সামান্য রুটি রয়েছে বটে। তবে টাটকা খাদ্য পেলে ও জিনিস কে খায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, বিজয়কে বাঁচাবার তাগিদে নিজে এতক্ষণ জল খায়নি। তাই গলার ভেতর শুকিয়ে কাঠ।

সে বলে,—আমি জল খেতে ভুলে গিয়েছি। একটু খেয়ে আসি।

সে অশ্বত্থ গাছের দিকে অগ্রসর হতে কবি বাধা দেন। বলেন,—দাঁড়াও। তুমি এখন যেতে পারবে না। শুনছ না ? অপেক্ষা কর। আমি এনে দিচ্ছি।

—না না। আপনি বয়স্ক। সে হয় না। আমি যাচ্ছি।

কঠিন কণ্ঠে কবি বলে ওঠেন,—এ আমার আদেশ। চুপ করে দাঁড়াও। এই বনে আমার আদেশ চূড়ান্ত।

—আমি পালন করতে পারি না। এই বনে আপনি বাস করলেও এটি মেবারের অন্তর্গত।

—ও, তুমি বুঝি মালদেও-এর আদেশ পালন করবে শুধু ? চিতোরগড়কে সে শাসন করছে কিনা।

—না। মালদেওকে আমি ঘৃণা করি। আমি একমাত্র রাণার আদেশ পালন করতে সবসময় প্রস্তুত।

—রাণা ? অজয় সিং ? ওর রক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা। অনেক চেষ্টাতে ওর রক্তে আগুন লাগাতে পারিনি। এত বছরের মধ্যে একবারও তলোয়ার উঁচিয়ে ছুটে যেতে পারল না চিতোরের দিকে। কাপুরুষ। তারই আদেশ তুমি শুধু পালন করতে প্রস্তুত। ভাল, বেশ ভাল।

কিশোরের মস্তক আনত হয়। চারণ কবির এই শ্লেষ অহেতুক নয়।

কবি তার পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বলেন,—চল। দুঃখ কোরো না। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ এমন রগ-চটা হয়ে ওঠে। তোমার পিপাসার জল আমার আস্তানায় মিলবে।

নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য তরুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে। এ-জিনিস ভাল নয়।

সে বলে,—আমায় ক্ষমা করেছেন ?

—ক্ষমা? অপরাধ করলে কোথায়? চল। ঘোড়াটাকে নিয়ে চল। এখানে রাখলে গুটি কয়েক হাড় ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাবেনা কাল সকালে।

ঘোড়াটাকে নিয়ে তরুণ কবিকে অনুসরণ করে। কিছুদূর চলার পর একটি গুহার সামনে উপস্থিত হন কবি। মজবুত কাঠের তৈরী কপাট গুহার সঙ্গে লাগানো।

—এই হল আমার আস্তানা।

—সুন্দর তো!

—হ্যাঁ। সুন্দর বৈকি! ভেতরে এসো।

—আমার ঘোড়া?

—নিয়ে এসো ভেতরে। ঢুকতে পারবে।

কবির পেছনে পেছনে তরুণ গুহার ভেতরে প্রবেশ করে। গাঢ় অন্ধকার। কবি এই অন্ধকারের মধ্যে একটি বাতি জ্বেলে ফেলেন। তরুণ দেখে গুহাটি বেশ দীর্ঘ। কারণ বাতির আলো বেশীদূর পৌঁছোয় না।

কাঠের কপাট কবি বন্ধ করে দেন। ঘোড়ার লাগামটি নিজের হাতে নিয়ে তার প্রান্তদেশ একটি ভারী পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে দেন।

—চল। আগে তোমাকে জল দেব। তারপর রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা।

—আর চিতোরের কথা?

—তার জন্যে সারারাত রয়েছে। তবে কাজ করতে করতেই শুরু করে দেব।

বাহুল্য বর্জিত গুহাটি বাস করার পক্ষে আদর্শ। কবি অনেক যত্নের সঙ্গে খাবার তৈরী করেন। জোয়ারের রুটি আর তরকারি। তার ঘোড়াটিও অভুক্ত থাকলো না একেবারে।

খেতে খেতেই শুরু হয়ে যায় চিতোরগড়ের কাহিনী। তরুণের সম্মুখে এক অপূর্ব জগতের ছবি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। একটির পর একটি বিস্ময়—শিহরণের পর শিহরণ—আনন্দ ক্রোধ উত্তেজনা—কবির বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর প্রতিফলিত হতে থাকে। মাঝে মাঝে কবি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। উদাত্ত কণ্ঠে স্বদেশ প্রেমের গান গেয়ে ওঠেন। কিশোরের ধমনীর রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে।

সহসা চারণ কবি চিৎকার করে ওঠেন—অজয় সিং আবার রাণা! চেনো তুমি? দেখেছ কখনো তাকে?

রাণার বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য শোনার অভ্যাস নেই তরুণের। অন্য কোথাও হলে সে এতক্ষণে একটা কিছু করে বসত। কিন্তু এই স্থান সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। সংযত ভাবে ঘাড় হেলিয়ে জানায় যে দেখেছে রাণাকে সে।

কবি বলেন,—তার কথা তুমি জান?

—আপনি বলুন।

—শোন তবে। পদ্মিনী দেবীকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন একবার বেজায় ঠকে গিয়েছিলেন। তাই দ্বিতীয়বার যখন এলেন বারো বৎসর পরে, তখন আরও কৃতসংকল্প হয়ে এলেন। অবরোধের ব্যবস্থা আরও মজবুত হল। চিতোরগড়কে রক্ষার আর কোন উপায় রইল না। প্রথমবারের আক্রমণে চিতোরের সমস্ত বীর এবং সম্ভাব্য বীরেরা আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। এবারেও প্রতিদিনের যুদ্ধে চিতোর ধীরে ধীরে বীরশূন্য হতে থাকে। সেই সময় একদিন রাতে রাজা লক্ষ্মণ সিং-এর সামনে উপস্থিত হলেন স্বয়ং চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বলে উঠলেন,—ম্যায় ভুখা হুঁ। বারো বছর আগেও একবার তিনি এই ভাবেই রাণার সামনে দর্শন দিয়েছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিন ফিরে যাওয়ায় রাণা সেই আবির্ভাবকে নিজের উদ্ভট কল্পনা বলে ভেবে নিয়ে ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এবারে? রাজা চোখ কচলে নিয়ে দেখলেন দেবী তখনো দণ্ডায়মান। আবার বলে উঠলেন,—ম্যায় ভুখা হুঁ। তবু রাণার বিশ্বাস হল না। পরদিন সভাসদদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। স্থির হল, রাতে সবাই মিলে রাজার ঘরে উপস্থিত থাকবেন। সে রাতে অপেক্ষা করতে করতে সবাই যখন ক্লান্ত, যখন তারা রাণার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছে, তখন একটা উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠল সবার চোখের সামনে। সেই আলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন দেবী। বললেন,—আমায় অবহেলা করেছ লক্ষ্মণ সিং। মহারাণা ভীত হয়ে করজোড়ে বলে ওঠেন,—মা, আমি বুঝতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন। বলে দিন কীভাবে আপনার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। দেবী স্পষ্টভাবে বলেন,—রাণার রক্তে। ভুলে যেওনা শুধু রাণার রক্তে। ভুলে যেও না, একজন নয়, দুজনও নয়, বারোজন রাণার রক্তে আমার ক্ষুধা মিটবে। সভাসদগণ থরথর করে কাঁপতে থাকে। লক্ষ্মণ সিং ভগ্ন কণ্ঠে বলেন,—এ তুমি কী বলছ মা? চিতোরগড় যে যুগের পর যুগ পরের অধীনে থেকে যাবে। তার চাইতে আমাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা কর মা। কিন্তু দেবীর কথায় সবকিছু জলের মত স্পষ্ট হয়ে যায়। লক্ষ্মণ সিং বুঝলেন, তাঁর বারোজন পুত্র সন্তান। প্রতিদিন একটি করে পুত্রকে রাণার পদে অভিষিক্ত করা হবে। তার পর সে যুদ্ধযাত্রা করলে,—আর ফিরে আসবে না। বারোদিনেই বারোজন রাণার রক্তে দেবীর ক্ষুধা মিটবে।

কিশোর মুগ্ধ হয়ে বসে থাকে। বাতিটি নিভে আসছে। বাইরে হিংস্র পশুদের অবিরাম গর্জন। সেই গর্জনের সাথে সাথে বিজয়ের পা ঠোকার শব্দ।

তরুণ বলে,—এসব কি সত্যি ?

—হ্যাঁ। খুবই সত্যি। লক্ষ্মণ সিং সব চাইতে ভাল বাসতেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংকে। তিনি ঠিক করলেন তিনি নিজে এবং তাঁর এগারোজন পুত্র প্রাণ দেবেন। বারোজন রাণা প্রাণ দিলেই দেবী সন্তুষ্ট। অজয় সিংকে তিনি আলাউদ্দিনের অবরোধ ব্যূহের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন দূরে। সঙ্গে থাকবে তাঁর কিছু বিশ্বস্ত সর্দার এবং তাঁর নিজস্ব পরিবারের লোকজন। অজয় সিং প্রথমে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বংশরক্ষা অন্য ভাবেও হতে পারে। কারণ রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী তাঁর-শিশুপুত্রকে নিয়ে তখন পিতৃগৃহে। কিন্তু মহারাণা এতে রাজী হননি। এতে অনিশ্চয়তা ছিল। অবশেষে চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে অজয় সিংকে চিতোর ছেড়ে আসতে হল। লক্ষ্মণ সিং-এর আশা ছিল তাঁর প্রিয়তম পুত্র কিছুদিনের মধ্যেই চিতোরগড় পুনর্দখল করবেন। তাঁর সেই আশা আজও ফলবতী হল না।

চারণ কবি তাঁর কাহিনী শেষ করে চেয়ে দেখেন, তরুণের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ক্রোধে কেঁপে ওঠেন তিনি। চিৎকার করে বলেন,—রাজপুত হয়ে চোখের জল ? ধিক্। আমি কার কাছে এত কথা বললাম ? একজন শৃগালের কাছে ? সময়ের অপব্যয় হল শুধু শুধু। এই দুর্গম স্থানে একা আসতে দেখে ভুল করে ফেললাম। ভেবেছিলাম, তুমি বীর—সাহসী। তা তো নও।

তরুণ শান্ত কণ্ঠে বলে,—ক্ষমা করবেন। চোখের জল এসেছে ব্যক্তিগত কারণে। আপনার কাহিনীর সঙ্গে এই জলের সম্পর্ক আছে বটে। কিন্তু যা ভাবছেন, তা নয়।

—তবে কি ?

—আপনার কাহিনী শুনতে শুনতে মনে পড়ছিল আমার বাবার কথা। তিনিও ছিলেন সে সময়ে। আজ মৃত।

—ও। চিতোরের সেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন বুঝি ?

—হ্যাঁ। প্রথম দিনেই। মায়ের মুখে শুনেছি। মা আমাকে নিয়ে তখন দূরে একটি গ্রামে ছিলেন। আমার বাবা বীর ছিলেন।

—তবু তোমার অশ্রুজল শোভা পায় না। অশ্রুকে আগুনে পরিণত করতে পারো না ? চেষ্টা কর, নিশ্চয় পারবে।

—আশীর্বাদ করুন। আমি চেষ্টা করব।

—অজয় সিং চিতোর উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু তার দুই পুত্র রয়েছে, সুজন আর অজিন। তাদের মধ্যে একজন অন্তত বীর হবে আশা রাখি।

তাদের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতে পারো চিতোরগড় উদ্ধারের জন্যে।

—তাই করব।

রাত গভীর হয়। দূর থেকে মাঝে মাঝে দুর্বল প্রাণীর আর্তনাদ ভেসে আসে। মৃত্যুর পূর্বে শেষ চিৎকার।

কবি বলেন,—পৃথিবীতে দুর্বল হয়ে বেঁচে থাকা যায় না।

তরুণ সহসা প্রশ্ন করে বসে,—রাণা অজয় সিং-এর পর তাঁর ছেলেরাই কি রাজা হবেন?

চারণ কবি চমকে ওঠেন। কেমন ধরনের প্রশ্ন এটি? তরুণের মনে এই ধরনের প্রশ্নের উদয় হল কেন?

তিনি বলেন,—রাণার পরে কে রাণা হয়? জান না? তাঁর ছেলেদেরই একজন হয়।

—জানি। কিন্তু সব সময় এমন যে হতেই হবে তার কোন মানে নেই। আপনি রাণা লক্ষ্মণ সিংকে চিনতেন নিশ্চয়।

—হ্যাঁ। খুব ভাল চিনতাম। ঘনিষ্ঠতা ছিল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। তাঁর অনুরোধেই আমি অজয় সিং-এর সঙ্গে চিতোরগড় ছেড়ে চলে আসি।

—তবে তো আপনি আরও ভাল বলতে পারবেন।

চারণ কবি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তরুণের প্রশ্নটি অদ্ভুত শোনালেও, আসলে এর পেছনে একটি সত্য লুকিয়ে রয়েছে। সেই সত্য এর কাছে প্রকাশ করার কথাই ওঠে না। আসলে অজয় সিং-এর পুত্রদের রাণা হবার কথা নয়! মহারাণা লক্ষ্মণ সিং-এর আদেশ ছিল অন্য রকম। সেকথা জানে শুধু অজয় সিং আর তিনি। হয়ত বা দুই একজন অতি বিশ্বস্ত সর্দার।

কিন্তু এই কিশোর যেন জেনেশুনেই তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চায়। কি করে জানতে পারে? তিনি নির্বাপিত বাতি আবার জ্বালান। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিশোরকে দেখতে থাকেন। তারপর তার মুখ চোখ এবং হাত দুখানা দেখে পরিচিত কারও ছায়া ভেসে ওঠে। তার কাঁধ দুটো সজোরে চেপে ধরে বলেন,—তুমি কে? কে তুমি?

ধীর কণ্ঠে কিশোর বলে,—কাউকে না বললেও আপনার কাছে আমার পরিচয় নিশ্চয় দেব। কিন্তু তার আগে আমাকে বলুন সব সময়ে কি রাণার ছেলেই রাণা হন?

চারণ কবি বুঝতে পারেন, এর কাছে গোপন রাখার কোন অর্থ নেই,

এ সব জানে। শুধু স্থির নিশ্চয় হতে চায়। তবু বলেন,—প্রতিজ্ঞা কর, একথা তুমি ছাড়া পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানবে না? প্রতিজ্ঞা কর। মনে রেখো, তুমি রাজপুত। তবু আমি বলতাম না। শেষে ভাবলাম, একজনকে অন্তত বলে রাখা ভাল। আমার মৃত্যু হতে পারে যখন তখন।

—আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

—শোন তবে। তোমার ধারণাই সঠিক। না, রাণা অজয় সিং-এর কোন পুত্র নয়, অজয় সিং-এর মৃত্যুর পর রাণা হবার কথা আর একজনের। মহারাণা লক্ষ্মণ সিং-এর এটা ছিল কঠিন নির্দেশ।

—কে সে?

—লক্ষ্মণ সিং-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র অরি সিং-এর একমাত্র পুত্র।

তরুণের হাবভাব বা আচরণে কোনরকম বৈলক্ষণ প্রকাশ পায় না। এই একান্ত গোপনীয় সংবাদটি সে অতি সহজভাবে নিয়ে বলে,—কথাটা তাহলে সত্যি।

—তুমি জানতে?

—হ্যাঁ। মায়ের মুখে শুনেছি।

—মায়েব মুখে? কে তুমি? তোমার মা কে?

—আমার মা এক অতি সাধারণ কৃষক পরিবারের কন্যা।

—তিনি একথা জানতে পারেন না। অসম্ভব। রাজ পরিবারের কেউ ছাড়া এ খবর জানার কোন সুযোগ নেই।

—কিন্তু তিনি যে রাজপ্রাসাদেই থাকেন।

—কৃষক পরিবারের মেয়ে রাজপ্রাসাদে? কোন কাজ করেন?

—না। আমার মায়ের ছিল অসাধারণ শক্তি আর সাহস। তাই দেখে এক রাজপুত্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি মাকে বিয়ে করেছিলেন।

চারণ কবি দুবাহু বাড়িয়ে তরুণকে জড়িয়ে ধরেন। বলে ওঠেন,—যথেষ্ট হয়েছে। আর বলতে হবে না। তুমি হাম্বীর—অরি সিং-এর পুত্র। মেবারের ভাবী রাণা।

চারণ কবিকে আবিষ্কার করার আনন্দে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ফিরে আসে হাম্বীর। সে জানে, খবরটা মাকে চমকে দেবে। তাই চারণ কবির কাছ থেকে শোনা গানের কলি গুন্‌গুন্ করতে করতে পরদিন সন্ধ্যায় সে প্রাসাদের অশ্বশালায় এসে পৌছোয়। বিজয়-এর সামনে নিজের হাতে খাবার ধরে দিয়ে, একজন কর্মচারীকে তার গা ঘষে দেবার আদেশ দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলতে থাকে মায়ের কাছে।

কিন্তু মাঝপথে একটা ছোট্ট পাথরের টুকরো তার মাথায় এসে পড়ে। সে থেমে এদিক-ওদিক চায়। কাউকে চোখে পড়ে না। মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। ভবানী ছাড়া আর কেউ না। তারই মাতুলালয় থেকে এসেছে এই কিশোরী কিছুদিন হল। মায়ের টুক্‌টাক্‌ কাজ করে দেয়। কিন্তু এসেই একটা জিনিসকে সে প্রধান কর্তব্য বলে বুঝে নিয়েছে। হাম্বীরের পেছনে লাগা।

হাম্বীর আর একবার এদিক ওদিক চেয়ে দৌড়তে গেলেই পাশ থেকে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে ভবানী।

—কি হচ্ছে ভবানী।

—কিছুই না। ভাবছি, এতবড় বীর অথচ শত্রুকে খুঁজে বার করতে পারে না।

—তুমি আবার শত্রু নাকি?

—হতেও তো পারি। তাছাড়া, পাহাড়-পর্বতে এমন কত শত্রু লুকিয়ে থাকে।

—ও, এবার থেকে তোমার কাছে শিখে নেব।

—বীর হাম্বীর কোথায় ছিলেন এতদিন? চিতোরগড় উদ্ধার করে এলেন বুঝি?

—আঃ, ওসব নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।

—ওমা ঠাট্টা করলাম কোথায়? সত্যি সত্যিই জানতে চাইছি।

হাম্বীর জানে, ভবানীর কথার উত্তর দিতে গেলে কখনো শেষ হবে না। সে তাই একছুটে গিয়ে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে।

—একটা নতুন খবর মা।

—কি খবর?

—তুমি যে কবির কথা বলতে তাঁকে খুঁজে পেয়েছি।

—কোথায়?

হাম্বীর তখন তার অভিযানের কাহিনী একে একে বলে যায়। তার মা তন্ময় হয়ে শোনেন। শেষে হাম্বীর লক্ষ্মণ সিং-এর শেষ আদেশের কথা বলতেই মা প্রশ্ন করেন,—একথা তুমি জানতে চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ মা।

মায়ের মুখে বিরক্তি। বলেন,—কেন?

—আমার জানার আগ্রহ ছিল কথাটা কতখানি সত্যি।

—চারণ কবি তোমার পরিচয় জেনেছেন?

—হ্যাঁ মা।

—তুমি মস্ত ভুল করেছ। তিনি ভাবলেন, মেবারের মহারাণা পদের ওপর

তোমার লোভ আছে।

—সেকথা কেন ভাববেন ?

—লোকে তাই ভেবে থাকে।

—কিন্তু আমি তো জানি, লোভ আমার নেই। কখনো দাবী করব না। মুখ ফুটে রাণা লক্ষ্মণ সিং-এর শেষ আদেশের কথা কাউকে বলব না।

—তবু।

—আমার অন্যায় হয়েছে মা।

—না, অন্যায় হবে কেন ? ভুল হয়েছে। তা হোক। মানুষের জীবনই ভুলে ভরা। পরে বুঝবে। মানুষের জীবনে একমাত্র সত্য স্বদেশ প্রেম, বীরত্ব, সততা।

—চারণ কবি কী সুন্দর গাইতে পারেন।

—এখন তো তিনি বৃদ্ধ। ওঁর কণ্ঠস্বর মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারত।

কিশোরী ভবানী এসে হাম্বীরের মায়ের পাশে ভাল মানুষের মত দাঁড়ায়। ওর চোখে রাজ্যের কৌতূহল।

হাম্বীরের মা প্রশ্ন করেন,—কিরে ভবানী। দরকার আছে কিছু ?

— না। বলছিলাম কি, বীর হাম্বীর তো যুদ্ধ করে এলেন। খিদে পায়নি ? পেলে এখানেই নিয়ে আসি।

হাম্বীরের মা হেসে ফেলেন। ভবানীর মুখখানা সরলতায় ভরা অথচ কথার মধ্যে কৌতুক। তাই তিনি বলেন,—কেন ? এখানে আনবি কেন ? ও একটু বিশ্রাম করে নিক।

—আচ্ছা। আমি ভাবলাম, এখুনি বোধহয় যুদ্ধ করতে বার হয়ে যাবেন আবার।

—অত যুদ্ধ যুদ্ধ করছিস কেন ?

—শুনলাম যে।

—কি শুনলি ?

—কোন্ মুনজা সর্দার না কে, খুব ঝামেলা করছে। আমাদের ক্ষেত থেকে ফসল নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।

—কে বলল ?

—কেন রাজসভায় আলোচনা হয়েছে তো।

সর্দার মুনজার নাম হাম্বীরের অজানা নয়। লোকটা মাঝে মাঝে উপদ্রব করে বটে। কিন্তু রাজসভায় যখন আলোচিত হয়েছে, তখন গুরুতর কিছু ঘটেছে

নিশ্চয়। সে ভবানীকে বলে,—মিথ্যে নয় তো?

ভবানী জ্বলে ওঠে,—মিথ্যে? আমি মিথ্যে কথা বলি কখনো?

ওর তেজ দেখে হাম্বীরের হাসিও পায়, ভালও লাগে। সে বলে,—ঠিক আছে। মনে থাকে যেন। আমি এখনি গিয়ে জেনে আসছি।

ভবানী হাত উল্‌টে বলে,—অত কষ্ট করে কি হবে? আমার মুখেই তো শোনা হল। এখন দুটি মুখে দিলে মন মেজাজ পেট সবই ঠাণ্ডা হয়।

হাম্বীরের মা আবার হেসে ফেলেন।

ভবানী সত্যিই মিথ্যে বলেনি। সর্দার মুঞ্জা সম্বন্ধে রাজসভায় আলোচনা হয়েছিল ঠিকই। এতদিন সে উপদ্রব করত বটে, কিন্তু সেই উপদ্রবকে দস্যুতা বলে চালানো হত। কিন্তু রাজার তরফ থেকে বিশেষ কোন বাধা আসেনি বলে, তার সাহস সীমা ছাড়াল। সে একদিন দলবল নিয়ে শেরো নালা আক্রমণ করে অধিকার করে নিল।

চিতোরগড় উদ্ধারের কোন উদ্যোগ আয়োজন করতে না পেরে রাজা অজয় সিং-এর মনে সব সময় একটা অপরাধ-বোধ পীড়া দিত। তাই মুনজার বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও অতটা গুরুত্ব দিতে চাননি তিনি। কিন্তু এবারে তাঁর সম্মানের ওপর ঘা পড়েছে। তাই মুনজাকে দমনের জন্যে একটা অভিযান চালানোর ব্যবস্থা করলেন। নিজে কখনো যুদ্ধবিগ্রহ করেননি বলে, এবারে নিজেই চললেন দলপতি হয়ে।

হাম্বীরের বড় ইচ্ছে ছিল রাণার সঙ্গী হবার। রাণা রাজসভার কাজ শেষ করে প্রাসাদে ফিরলে সে তাঁর সামনে গিয়ে বিনীতভাবে তার ইচ্ছার কথাটা জানাল!

রাণা হাম্বীরকে কিছুক্ষণ ধরে দেখে নিয়ে বলেন,—সুজন আর অজিন কোথায়?

—ওরা শিকারে গিয়েছে।

—ওরা ফিরে আসুক আগে। যেতে চায় কিনা দেখি।

হাম্বীর বলে,—ওরা আমার চেয়ে ছোট। আমার দাবী তো আগে।

—নিশ্চয়। তোমার দাবী সব সময় আগে। সব ব্যাপারেই। তবু আমি ওদের একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই।

হাম্বীর একটু হতাশ হয়। ফিরে যাবে বলেই ভাবছিল। কিন্তু সেই সময় সুজন আর অজিন দুজনারই উত্তেজিত গলা শোনা যায় বাইরে।

হাম্বীর বলে ওঠে,—ওরা এসেছে।

—হুঁ। গলা শুনে মনে হচ্ছে বিরাট কোন কীর্তি করে এসেছে। ডেকে আনো।

হাম্বীর দ্রুতপদে চলে যায়।

রাণা অজয় সিং কী যেন চিন্তা করতে থাকেন।

একটু পরে হাম্বীরের সঙ্গে ঘর্মাক্ত কলেবরে দুই ভাই এসে প্রবেশ করে।

রাণা প্রশ্ন করেন,—কি শিকার করে আনলে?

আজিন বলে,—একটা বন-বেড়াল। খুব ঘুরিয়েছে আমাদের।

—ও। আমি তোমাদের গলা শুনে ভাবলাম, বুঝি বাঘ মেরে এসেছ।

—বাঘ কোথায় পাব। তীর ধনুকে বাঘ মারা যায় না।

—বল্লম নিয়ে গেলেই পারতে। তলোয়ার ছিল না অস্ত্রাগারে?

সুজন ধীর কণ্ঠে বলে,—আমাদের বাঘ মারার বয়স হয়নি।

—তাই নাকি? যুদ্ধ করার বয়স হয়েছে?

—বড় যুদ্ধ?

—না। খুবই ছোট যুদ্ধ। অস্ত্রও ধরতে হবে না হয়ত। কাল আমি যাচ্ছি সর্দার মুনজাকে দমন করতে। সঙ্গে যাবে?

সুজন আর অজিন উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চায়। তারপর অজিন বলে ওঠে,—কাল আমরা অন্যদিকে শিকারে যাব ভাবছি। তাতে কত আনন্দ।

মহারাণার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়,—তা বটে। শিকার মানে হল দুর্বলকে হত্যা করা। এতে বিপদ আছে। কিন্তু বিপদের শিকার তোমরা করছ না।

উভয়ে নীরব।

মহারাণা কঠোর কণ্ঠে বলেন—যাবে আমার সঙ্গে?

দুজনার কেউ জবাব দেয় না।

—বুঝেছি।

হাম্বীর উতলা হয়ে বলে,—আমাকে নিয়ে চলুন মহারাণা।

অজয় সিং কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। শেষে হাম্বীরকে কাছে ডেকে তার পিঠে হাত রেখে বলেন,—মন খারাপ কর না হাম্বীর। আমি তোমাকে নিতে পারব না। তোমাকে আরও বড় কাজ দেব।

—কি কাজ?

—এখন নয়। পরে জানাবো। সেই কাজের কথা জানলে কোন খেদই থাকবে না তোমার।

পরদিন হাম্বীর বিষণ্ণ মনে কক্ষে বসে রাণার যাত্রা দেখছিল। একটু আগে

সে রাণার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। রাণার সঙ্গী হিসাবে চলেছে পাঁচশো জন। একজন সর্দারকে দমন করতে এর চেয়ে বেশী লোকের প্রয়োজন হয় না।

—যুদ্ধ যাত্রা দেখা হচ্ছে বীর হাম্বীর?

—আবার এসেছ ভবানী জ্বালাতন করতে?

—আমি বুঝি শুধু জ্বালাতনই করি?

—তাছাড়া কি? সব সময় বীর হাম্বীর বীর হাম্বীর বল। কেন?

—তুমি বীর নও?

—এখনো তা প্রমাণ হয়নি।

—হবে।

—ওভাবে কখনো ডেকোনা আমাকে।

—বেশ। তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়। তোমার কথার অমান্য করতে পারি?

—আর কখনো আমাকে 'আপনি' বলে ঠাট্টা করবে না।

—বেশ। তুমি হলে রাণা বংশের সন্তান। তোমার কথার অমান্য করতে পারি?

—কখনো বলবে না চিতোরগড় উদ্ধার করে এলাম।

—বেশ। তুমি হলে দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার। তোমার কথার অমান্য করতে পারি?

—এখনো ঠাট্টা করছ।

—আমি?

—নিশ্চয়।

ভবানী খিলখিল্ করে হেসে ওঠে। তারপর ভিজে গলায় বলে,—আমি যে অন্যভাবে কথা বলতে পারি না। তাহলে আমাকে চুপ করে থাকতে হয়। তুমি কি তোমার সঙ্গে কথা বলতে মানা করে দিচ্ছ?

—মোটেই না। আমি বলছি, তুমি মায়ের সঙ্গে যেভাবে কথা বল, আমার সঙ্গেও সেইভাবে বলবে।

—তোমার মা তো অনেক বড়।

—আমি কি ছোট? তুমি আমার মামা বাড়ির গাঁয়ের মেয়ে বলে কিছু বলি-না। নইলে দেখতে।

—কি দেখতাম।

—জানি না। এখন যাও তো।

ভবানী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর হাম্বীরের কাছে এসে বলে,—জান হাম্বীর আমি চিতোরগড় দেখতে পাই।

হাম্বীর চমকে ওঠে,—কি ? কি বললে ?

—হ্যাঁ। সত্যিই দেখতে পাই। ওই যে—ওই দিকে তো চিতোর ? রাতেরবেলা তোমরা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়, আমি একা একা উঠে যাই প্রাসাদ-শীর্ষে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থাকি। প্রথমে কিছুই দেখতে পাই না ! তারপর ধীরে ধীরে দেখি একটি একটি করে আলোর মালা ফুটে ওঠে। তারপর—জানো হাম্বীর—তারপর আমি সব দেখতে পাই।

ভবানীর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হাম্বীর। তার ধারণা ছিল মেয়েটি শুধু হাল্কা কথাবার্তাতেই ওস্তাদ। কিন্তু তার ভেতর এত গভীরতা ? কী দেখতে পায় সে তারপরে ?

—থেমে যেওনা ভবানী। তারপর ? তারপর কি দেখতে পাও তুমি ?

—সবকিছু। জানো, আমি পদ্মিনীকে দেখতে পাই। তিনি বসে রয়েছেন। তিনি নীরবে চোখের জল ফেলছেন। জহরব্রতের আগুন জ্বলে উঠতে দেখি। না না, এ আমার কল্পনা নয় হাম্বীর। তোমাকে যেমন দেখছি, ঠিক তেমনি। আমি গোরা বাদলের যুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি। আমি তোমার বাবাকে দেখি। ঠিক তোমার মত দেখতে। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো তো, ঠিক দেখি কিনা ? আরও দেখি।

—কি ?

এবারে ভবানী উত্তেজিত। ক্রোধে আরক্ত। বলে,—আমি মালদেওকে দেখি। তার ছেলেদের দেখতে পাই। ওরা ঘুরে বেড়ায়। পদ্মিনীর ঘরের মধ্যে ওরা যখন যায়, তখন আমার সহ্য হয় না। আর আমি দেখি একটি মেয়েকে। মনে হয় সে বিধবা। অথচ কত কম বয়স। একেবারে বালিকা। মনে হয় সে জানেনা যে তার স্বামী নেই। সবার মত সব কিছু করতে গিয়ে বাধা পায়। কড়া শাসন করে সবাই ওকে। ও ছলছল্ চোখে চেয়ে থাকে। মালদেও-এর পরিবারের মধ্যে ওর জন্যে কেন যেন আমার কষ্ট হয়।

—হাম্বীর বলে—ভবানী, তুমি স্বপ্ন দেখো না তো ?

—না, না। আমি জানি কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই বলিনা। আজ তোমাকে কেন যেন বলে ফেললাম। যদি বিশ্বাস না কর, ভুলে যেও। এ নিয়ে আমাকে খোঁচা দিও না।

—না খোঁচা দেব কেন ? আমি বিশ্বাস করি। তুমি ঠিকই দেখো।

—সেই জন্যেই তোমাকে চিতোর উদ্ধারের কথা বারবার বলি। তুমি রেগে যাও জানি।

—আর রাগব না।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে বীর হাম্বীর আমি চলি এখন। দেরি হয়ে গেল।

হাম্বীর একটু হাসে। ভবানী চিতোরগড়কে কত ভালবাসে। সে নিশ্চয়ই অতটা ভালবাসে না। একবারও তো মনে হয়নি চিতোরগড় কোন্‌দিকে। সে মনে মনে ঠিক করে, ভবানীকে কখনো কিছু বলবে না।

মেবারের রাণা বংশের যেটুকু সম্মান অবশিষ্ট ছিল, তাও যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মুনজার সঙ্গে যুদ্ধে মহারাণা ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে ফিরে এসেছেন। সাধারণ ব্যর্থতা এটি নয়। দস্যুকে দমন করতে গেলে, অনেক সময় দস্যুদের পাত্তা পাওয়া যায় না। তারা গা ঢাকা দেয়। কিন্তু এবারের ঘটনাটি সহজ নয়। মুনজা রীতিমত মহারাণার বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছে। বীরের মত লড়েছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করত। কিন্তু তার আগেই সে চরম আঘাত হানে। যুদ্ধে মহারাণাকে সে আহত করে। মস্তকে আঘাত পেয়ে মেবারের মহারাণা অজয় সিং ফিরে এলেন কৈলওয়ারাতে।

এ খবর হাম্বীর প্রথম পেল তার মায়ের কাছে। রাজধানীতে যতটুকু সময় সে থাকে, শুধু স্বপ্ন দেখে। ভবানীর কাছ থেকে এই স্বপ্ন দেখা সংক্রামিত হয়েছে তার মধ্যে। এতে এক অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করা যায়। কত সময় মনে হয়েছে তার, ছদ্মবেশে একবার পিতৃপুরুষের বাসস্থান দেখে আসবে। হয়ত এতদিনে চলেও যেত। মা অনুমতি দেন নি।

মা যখন বললেন যে রাণা আহত হয়ে ফিরে এসেছেন, তখন হাম্বীর প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চায় নি। সে বলে,—পড়ে গিয়েছিলেন ?

—না।

—তুমি কি বলছ যে, মুনজার সঙ্গে যুদ্ধে মহারাণা আহত হয়েছেন ?

মা কোনমতে বলেন,—হুঁ।

—আমি প্রতিশোধ নেব।

—সে তো নেবেই। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে হলে রাণার অনুমতির প্রয়োজন।

হাম্বীর দ্রুতগতিতে রাজসভার দিকে যেতে থাকে। সে জানে না রাণা কতটা আহত। তিনি রাজসভায় আসতে পেরেছিলেন কিনা তাও জানে না। সভায় না পেলে তাঁর শয়নকক্ষে শয্যার পাশে গিয়ে অনুমতি চেয়ে নেবে।

রাজসভায় প্রবেশ করে হাম্বীর দেখে রাণা সেখানে উপস্থিত। তবে সিংহাসনে

উপবিষ্ট নয়, একটি পৃথক শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন। সভাস্থল স্তব্ধ—যদিও সবাই সেখানে রয়েছে। রাণার মাথা এবং দেহের ক্ষতস্থানগুলো বাঁধা রয়েছে। তাঁর মুখে বিরক্তি আর হতাশার ভাব। তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর দুই পুত্র সুজন সিং আর অজিন সিং।

হাম্বীর জানে, সামান্য ভুলের জন্যে যে কোন বীর যোদ্ধার এই ধরনের পরাজয় ঘটতে পারে। কিন্তু অন্যে বুঝতে চায় না। তাই রাণা স্বভাবতই হয়ত সঙ্কুচিত। কিন্তু রাণা না হয়ে সে যদি পরাজিত হত, তবে কখনই ফিরে আসত না। পরাজিত হয়ে ফিরে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।

রাজসভায় ইতিমধ্যে কি ঘটে গিয়েছে হাম্বীর জানত না। জানলে সে-ও মাটির সঙ্গে মিশে যেত। হাম্বীরের ওপর দৃষ্টি পড়তে রাণার মুখে আশার আলো ফুটে ওঠে। তাকে তিনি ডাকেন।

অজয় সিং প্রশ্ন করেন,—হাম্বীর। তুমি আমার কে?

প্রশ্নটি বিচিত্র এবং আকস্মিক। তবু হাম্বীর একমুহূর্ত বিলম্ব না করে বলে,—পুত্র, মহারাণা।

—ঠিক। পুত্র। ভ্রাতুষ্পুত্র আর পুত্রের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। তোমার প্রতি আমার স্নেহ এই দুজনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং কর্তব্যবোধ এবং তোমার চরিত্রের বলিষ্ঠতা সেই স্নেহকে আরও প্রগাঢ় করে তুলেছে।

হাম্বীর বুঝতে পারে না, এ-ধরনের কথা রাণা আজ কেন বলছেন। আগে তো কখনো বলেননি। সে অপেক্ষা করে।

রাণার বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মাঝে মাঝে তিনি মুখ বিকৃত করেন। শেষে বলেন,—আমি কিভাবে আহত হয়ে ফিরে এসেছি শুনেছ নিশ্চয়।

—এইমাত্র মায়ের মুখে শুনলাম। শুনেই ছুটে এসেছি।

—বলতে পার হাম্বীর, আমার পুত্র হিসেবে তোমার কি কর্তব্য?

—মেবারের প্রজা হিসাবে, রাজপুত হিসাবে আমার কর্তব্য হল, যে আপনার গায়ে হাত দিতে সাহসী হয়েছে তার ছিন্ন মস্তক এনে আপনার পায়ে উপহার দেওয়া। মেবারের রাণার সম্মানে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেওয়া রাজপুত হিসাবে কি করে সহ্য করব?

হাম্বীরের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে রাজসভা গমগম্ করে ওঠে। অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি শুরু হয়ে যায়। সুজন আর অজিনের মস্তক অবনত হয়।

রাণা উৎসাহিত হয়ে বসতে গিয়ে যন্ত্রণায় আবার শুয়ে পড়েন। বলেন,—

রাজপুত? শুধু রাজপুত হিসাবে?

—হ্যাঁ, মহারাণা।

—আর পুত্র? পুত্র হিসাবে?

—পুত্র হিসাবে আমার কর্তব্য শত্রুকে হত্যা করতে না পারলে আর ফিরে না আসা।

সবাই বাহবা দিয়ে ওঠে। তাদের চোখে-মুখে বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া এক আশার ঝলকানি দেখা যায়। তাদের বুকের মধ্যে নতুন উদ্যম তোলপাড় করতে থাকে।

—হাম্বীর।

—মহারাণা।

—তুমিই আমার পুত্রদের মধ্যে যোগ্যতম। আমি প্রতিশোধ চাই।

—আমাকে যাত্রা করার অনুমতি দিন।

—দিলাম। কতজন সৈন্য তোমার দরকার?

—একজনও নয়।

সভাস্থল স্তম্ভিত। বাস্তববুদ্ধিহীন এ-ধরনের উক্তি প্রত্যাশা করেনি কেউ। তবে কি সবটাই নিছক ভাবাবেগ?

—হাম্বীর। উত্তেজিত হয়ো না। তুমি জান আমি ব্যর্থ হয়েছি। লোকটা কুশলী। তাছাড়া তার দলবলও নেহাৎ কম নয়।

—মহারাণা। আমি অনেক ভেবেই একা যেতে চাই। মুনজা যত শক্তিশালীই হোক, আমি একাই যথেষ্ট।

হাম্বীর ছুটতে ছুটতে বার হয়ে যায়। ষোল আর চোদ্দ বছরের সুজন ও অঞ্জন কলঙ্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে থাকে।

মায়ের কক্ষের সামনে এসে চিৎকার করে বলে—মা, আমি অনুমতি পেয়েছি। মুনজাকে হত্যা করতে যাচ্ছি। তুমি আশীর্বাদ কর মা।

মা বার হয়ে আসেন। তাঁর পেছনে ভবানী।

পুত্রের মাথায় হাত রেখে তিনি বলেন,—জয়ী হও।

হাম্বীর মায়ের পদধূলি নেয়।

ভবানী বলে ওঠে,—দাঁড়াও বীর হাম্বীর, আমি একটু প্রণাম করে নিই তোমাকে।

—কেন?

—তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ। চিতোর উদ্ধারের প্রথম কাজ শুরু হয়ে গেল।

—এর সঙ্গে চিতোর উদ্ধারের সম্পর্ক কি?

হাম্বীরের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ভবানী বলে,—নেই? বুঝতে পারছ না? তোমার বুদ্ধি দেখছি প্রায় আমারই মত।

হাম্বীরের মা বিরক্ত হয়ে বলেন,—কি বলছিস ভবানী।

থতমত খেয়ে ভবানী বলে,—অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

হাম্বীর তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে,—না না অন্যায় হয় নি। বল, কি বলতে চাও।

—তুমি জয়ী হয়ে ফিরবে। তোমার অভিজ্ঞতা বাড়বে—খ্যাতি বাড়বে। চিতোর দখলের সৈন্যদের তুমি হবে নেতা।

হাম্বীরের মা ভবানীর মাথায় হাত রেখে বলেন,—ঠিকই বলেছিস। তোর কৃষক পরিবারে জন্ম হল কেন?

ভবানী হেসে বলে,—আপনার বুঝি রাণার পরিবারে জন্ম?

হাম্বীরের মায়ের শরীর কেঁপে ওঠে।

গভীর পার্বত্য অরণ্যের ভেতর দিকে মুনজার সন্ধানে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে হাম্বীর। চলতে চলতে দুপুর পার হয়ে যায়। সে ধীরে ধীরে একটি পাহাড়ের শিখরে গিয়ে ওঠে। একবার চারদিকটা দেখে নেওয়া ভাল। আশেপাশে শত্রুরা লুকিয়ে থাকতে পারে। রাণা আহত হয়ে ফিরে যাবার পরে মুনজা কখনই নিশ্চিন্তে বসে নেই। সে জানে প্রত্যাঘাত আসবেই। রাণার পেছনে পেছনে সে হয়ত চর পাঠিয়েছে। সেই চর এখন তাকে অনুসরণ করছে কিনা কে বলতে পারে? কৈলওয়ারাতে বিশ্বাসঘাতকের অস্তিত্ব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চিতোরগড় হাতছাড়া হয়ে যাবার পর নাকি রাজপুত চরিত্রের অবনতি হয়েছে।

চারদিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় হাম্বীর। কোন অশ্বারোহীর হদিশ মেলে না। ঘোড়া থেকে নামে হাম্বীর। একটু বিশ্রাম করে নিতে হবে। সন্ধ্যা হতে খানিকটা দেরি আছে। ঘোড়ার লাগাম খুলে দিয়ে সে একটি গাছের নীচে বসে পড়ে।

এই প্রথম তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাণা অজয় সিং-এর দুই পুত্রের দণ্ডায়মান মূর্তি। সে জানে না রাজসভায় প্রবেশের আগে কি ঘটেছিল। অনুমান করে নিতে পারে মাত্র।

অশ্বকে ডেকে হাম্বীর বলে,—কিরে বিজয়, সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। আর কতটা পথ যেতে পারবি?

বিজয় বেশ উৎফুল্ল। সে ঘাড় নেড়ে নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে।

হাম্বীর হাসে। তারপর আপন চিন্তায় মগ্ন হয়। ভাবে, সে যদি ভবানীর মত দেশপ্রেমিক হতে পারত তাহলে বেশ হত। গাঁয়ের মেয়ে ভবানীর কানে এই মন্ত্র কে দিল? সে কি গত জন্মে পদ্মিনী ছিল? কিছুই বলা যায় না।

দমকা হাওয়ায় তন্ময়তা ভাঙে হাম্বীরের। চেয়ে দেখে আকাশের এক কোণে গাঢ় মেঘ জড়ো হয়েছে! দ্রুত ধেয়ে আসছে ওই মেঘ সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়তে। প্রচণ্ড ঝড় আসন্ন। এই ঝড়ের পরিচয় এদিকের মানুষদের অজানা নয়।

তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চেপে সে বলে,—শিগ্‌গির চল্ বিজয়। একটা আস্তানা দরকার। গুহা না পেলে বনের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। চল্ চল্—সামলে চল্।

প্রভুর কথা ঘোড়া ষোল আনা বুঝতে পারে। সে ঘাড় বেঁকিয়ে সাবধানে অথচ দ্রুতবেগে নীচে নামতে থাকে। কিন্তু তার বেগের চেয়ে মেঘের বেগ অনেকগুণ বেশী। হাম্বীর বলে ওঠে,—পারলি না তো? তোর কোন দোষ নেই। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম।

কিছুটা নেমে হাম্বীর একটি কুটির দেখতে পায়। এই নির্জন পর্বতবেষ্টিত জায়গায় কুটির দেখে সে কম অবাক হয় না। পাহাড়ের চূড়া থেকে এটি তার নজরে পড়েনি। একটি বিরাট পাথরের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। হাম্বীর বুঝতে পারে পাথরটি ছিল বলেই কুটিরখানির অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্ভব হয়েছে। নইলে ঝড়ে কবে উড়িয়ে নিয়ে যেত ওটিকে।

ঘোড়াটিকে নিয়ে সে কুটিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘোড়া থেকে নামে সে। কুটিরের কপাট হাট করে খোলা। ঘোড়ার রশি ধরে হাঁটতে হাঁটতে দাওয়ার কাছে এসে থামে। ভাবে, মুনজার আস্তানা নয় তো? দেখলে তেমন বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় অনেকদিনের পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু দাওয়াটি বেশ পরিচ্ছন্ন। আর ভেতর থেকে একটা ফুলের কিংবা অন্যকিছুর সুঘ্রাণও ভেসে আসছে যেন।

সে ডাকে,—কেউ আছেন কি ভেতরে? আমি অতিথি।

সেই সময় প্রচণ্ড ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় গাছপালা সবকিছু আর্তনাদ করে ওঠে। সেই শব্দে তার কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। সামনের বিরাট পাথরে ধাক্কা খেয়ে ঝড় যেন আরও ফুঁসে ওঠে।

হাম্বীর এবারে চিৎকার করে বলে,—শুনতে পাচ্ছেন? আমি অতিথি। অপেক্ষা করছি বাইরে।

কোনরকম সাড়াশব্দ নেই।

ততক্ষণে গাঢ় মেঘে সারা আকাশ আচ্ছন্ন। দিনের আলো সহসা অতি ক্ষীণ হয়ে আসে। সন্ধ্যার অনেক আগেই রাতের অন্ধকার নেমে আসে বনস্থলীতে।

হাম্বীর নিশ্চিন্ত হয়। অন্তত রাতের আশ্রয়ের জন্যে তাকে ভাবতে হবে না। সে তার দ্বিধাবোধ কাটিয়ে প্রথমে দাওয়ায় উঠে পড়ে। তারপর আর একবার বলে,—আমি ভেতরে যাচ্ছি। কেউ নেই ভেবেই যাচ্ছি। যদি কেউ থেকে থাকেন, তবে বুঝব তিনি নিঃসঙ্গ এবং রোগাক্রান্ত।

সে ভেতরে প্রবেশ করে।

সঙ্গে সঙ্গে একজন রমণী তরবারি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান। সেই অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝলকানিতে তাঁর অসামান্য রূপ ফেটে পড়তে চায়। এত রূপ হাম্বীর কল্পনাও করতে পারে না। সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে।

রমণী ক্রোধে ফুঁসছিলেন। তিনি বলে ওঠেন,—এতটুকু ভদ্রতাবোধ নেই তোমার? তুমি কি রাজপুত?

—হ্যাঁ। আমি রাজপুত। অভদ্রোচিত কোন ব্যবহার আমি করিনি।

—এটা কোন ধরনের ভদ্রতা? অনুমতির অপেক্ষা না করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লে?

হাম্বীর বুঝতে পারে বাইরে থেকে যে সুঘ্রাণ সে পেয়েছিল তা এই রমণীর দেহের। সে শান্ত কণ্ঠে বলে,—আমি ডেকেছি। কোন সাড়া পাইনি। ভেবেছিলাম, ভেতরে কেউ নেই।

—অমন ভাবনা অপরিণত মস্তিষ্কের পক্ষেই সম্ভব।

হাম্বীরের মাথায় রক্ত ওঠে। এ ভাবে বিনা দোষে কেউ তাকে কখনো অপমানিত করেনি। তবু সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। জবাব দেয় না কোন। কারণ শত হলেও এই রমণী খুবই অল্পবয়সী। নির্জন স্থানে তাঁর ভীতি অহেতুক নয়।

রমণী বলেন,—তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনা। সাহস থাকে অস্ত্রধারণ কর।

হাম্বীর অবাক হয়। এও কি ভীতির এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ? নইলে একজন যুবকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সাহস হয় কিভাবে?

সে শান্ত এবং কিছুটা অপরাধীর ভঙ্গীতেই বলে,—আমি এখুনি বাইরে চলে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

—কাপুরুষ। ভয় পেয়েছ অস্ত্রধারণের কথা শুনে।

—না। আমি স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি না।

—ওসব হল অজুহাত। যদি আক্রমণ করি আত্মরক্ষা করবে না তুমি?

—বাধ্য হয়ে করতে হবে। কিন্তু কেন এ সব বলছেন? আপনি তো ভালভাবেই জানেন, কোন অপরাধ আমি করিনি।

—না। আমি বিশ্বাস করিনা সেকথা।

—আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, আপনি কোন রাজার দুলালী। রাজার ঘরেও আপনার মত রমণী দুর্লভ। একজন মানুষের কথা বিশ্বাস করতে পারেন না? সে সত্যি বলছে, না মিথ্যা বলছে, সেটুকু বিবেচনা করার ক্ষমতা আপনার নেই?

—তোমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই। তুমি অন্যায় করেছ। আমি এখানে একাকিনী রয়েছি, জেনে ফেলেছ সেকথা। তোমাকে বাঁচতে দিতে পারিনা। অস্ত্র ধর।

সহসা হাম্বীর লক্ষ্য করে রমণীর তরবারি বিদ্যুৎ গতিতে তার মাথার ওপর নেমে আসছে। অভ্যাসবশে নিমেষের মধ্যে তরবারি কোষমুক্ত করে সেই আঘাত ঠেকায়।

সেই সময় ভীষণ বজ্রপাত হয়। তীব্র বিদ্যুতের আলোয় কুটিরটি ঝলসে ওঠে। তার অশ্ব বিজয় ডেকে ওঠে বাইরে। তাকে ডাকছে।

রমণী অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় পদচারণা করে হাম্বীরকে আবার আক্রমণ করেন। হাম্বীর বুঝতে পারে তাকে যুঝতেই হবে। রমণী তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতে চান। হয়ত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই কুটিরে তিনি রয়েছেন। হাম্বীরের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছেন।

সে একপাশে সরে গিয়ে রমণীর তরবারির ওপর আঘাত হানে। সে শুধু চায় রমণীকে নিরস্ত্র করতে। কিন্তু তার প্রচণ্ড আঘাত রমণীর অস্ত্রে লেগে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করলেও একটুও টলাতে পারে না। রীতিমত অবাক হয় সে।

সে দেখতে পায় রমণী এক নিমেষে পাশে সরে যান এবং অসাধারণ কৌশলে প্রচণ্ডভাবে তার অস্ত্রের ওপর ঘা দেন। সেই আঘাতে তার তরবারি গোড়া থেকে ভেঙে গিয়ে কয়েক টুকরো হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ে।

স্তম্ভিত হাম্বীর। যা ছিল স্বপ্নাতীত, তাই আজ বাস্তবে পরিণত। মুনজাকে হত্যা করা এ-জীবনে আর হল না তার। রমণী তাকে কৃপা করবেন না কখনই। করলেও সে বাঁচতে পারে না। জীবনের এই কলঙ্কময় অধ্যায় নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। এই কি তার মায়ের আশীর্বাদ?

রমণী খিল্‌খিল্‌ করে সুমিষ্ট হাসি হেসে ওঠেন! এত পরিশ্রমের পর তাঁর সেই হাসি খুবই সজীব। ক্লান্তির লেশমাত্র নেই তাতে।

দুপা এগিয়ে এসে তিনি বলেন—কি বীরপুরুষ। যুদ্ধের সাধ মিটেছে? তুমি নাকি রাজপুত? রাজপুত কখনো নারীর কাছে পরাস্ত হয় না।

—ঠিক বলেছেন। এবারে দয়া করে আমাকে হত্যা করুন।

—তুমি ভীত নও?

—আমার কথায় যদি বিশ্বাস করেন তবে বলব, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। প্রশ্ন করবেন না। দুঃসহ এই জীবন। হত্যা করুন।

—বেশ। দাঁড়াও তবে।

হাম্বীর মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

রমণী বলেন—এখানে নয়। ঘরের বাইরে এসো। তোমার মৃতদেহ আমি টেনে নিয়ে বাইরে ফেলতে পারব না।

হাম্বীর দাওয়ার ওপর দাঁড়ায়। মনে মনে মাকে প্রণাম জানায়।

রমণী একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাতের অস্ত্র বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—এটির আগা স্পর্শ কর।

হাম্বীর তাঁর কথামত সেটি স্পর্শ করতেই তিনি নিজের দিকে সামান্য টেনে নেন। ফলে হাম্বীরের তর্জনী একটু কেটে গিয়ে রক্ত বার হয়।

—এবারে তোমার তর্জনীর রক্তে কপালে তিলক আঁকো।

—কেন?

—জয় তিলক।

—সেকি! আপনার জয় তিলক আমার কপালে?

—যা বলছি কর। আত্মসমর্পণ যে করে প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা তার থাকা উচিত নয়। ওই জয় তিলক তোমার কপালে শোভা পাবে। তারপর তোমায় হত্যা করব।

হাম্বীর তর্জনীর রক্ত কপালে ছোঁয়ায়। বলে,—এবারে হত্যা করুন।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হবে। বাইরে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়াটি ছটফট করে। প্রভুর বিপদ বোধহয় সে অনুমান করতে পেরেছে। বিজয় কি তার মৃতদেহ দেখে কৈলওয়ারায় তার মায়ের কাছে ফিরে যাবে? হয়ত তাই যাবে। সওয়ারহীন ঘোড়াকে দেখে মুহূর্তে মা সব বুঝে ফেলবেন। কিন্তু তিনি কখনো জানবেন না। তাঁর পুত্র এক তরুণীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। না জানাই ভাল। জানলে তীব্র ধিক্কার নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটাতে হবে তাঁকে।

—রাজপুত। রমণীর কণ্ঠস্বর কোমল।

—বিদ্রূপ করবেন না। হত্যা করুন।

করুণার্দ্র কণ্ঠে রমণী বলেন—তুমি প্রকৃত রাজপুত। তোমার কপালে ওটি তোমারই জয় তিলক। এই নাও আমার অস্ত্র।

রমণীর কথায় এবং চোখের দৃষ্টিতে স্নেহ ঝরে পড়ে। এ কি মায়াবিনী? নাকি হত্যার পূর্বে এ এক ধরনের রমণীসুলভ অভিনয়? কিন্তু তাহলে অসিব ধারালো দিকটা নিজের হাতে ধরে রেখে হাতলটি তার দিকে এগিয়ে দেবেন কেন? হাম্বীর মন্ত্রমুগ্ধের মত সেটি গ্রহণ করে।

—এই অস্ত্র তোমাকে চিতোরগড় উদ্ধারে সহায়তা করবে। আশীর্বাদ করি তোমায়।

—আপনি? আপনি কে?

—আমি? রমণী হেসে ওঠেন। তাঁকে ঘিরে অদ্ভুত জ্যোতি প্রকাশ পেতে থাকে।

—হ্যাঁ। কে আপনি? বলুন।

—আমার ভুখা আর নেই হাম্বীর।

—মা! হাম্বীর দুটি পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে চরণ স্পর্শের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু মুখ তুলে দেখে কেউ নেই। বৃষ্টির অবিরল ধারা পড়তে শুরু করেছে। ঘোর মসিবর্ণ অন্ধকার চারদিকে।

হাম্বীরের চোখে জল। ছেলেমানুষের মত সে আকুল হয়ে বলতে থাকে,—মা, একবার শুধু দেখা দাও। এ ভাবে শত্রুর বেশে কেন এলে? কেন আমার মাথায় তোমার হাতের পরশ পেলাম না!

কিন্তু সব আকুতি তার ব্যর্থ। দেবী আর এলেন না। তবে রেখে গেলেন একটি সুকঠিন বাস্তব পদার্থ। সেটি এই তরবারি। হাম্বীর বুকে চেপে ধরে।

ভোরবেলা রওনা হয় হাম্বীর। নিদ্রাবিহীন রজনী কেটেছে এক অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনার মধ্যে। দেবীপ্রদত্ত অস্ত্র তার মনে অসীম শক্তি এনে দিয়েছে। বার বার তাতে মাথা ঠেকিয়েছে। কতবার চুম্বন করেছে। শেষে রাত কাটতেই বাইরে এসে অস্ত্রটি ভালভাবে দেখেছে। তাতে তারই পূর্বপুরুষ বাপ্পার নাম খোদাই করা। একদিকে লেখা রয়েছে চিতোরগড়।

চলতে চলতে সে বলে—বুঝলি বিজয়। এবারে আর মুনজার রক্ষা নেই। শেষ করে দেব। বুঝলি? কিছু বলছিস্ না কেন?

ঘোড়াটি শব্দ করে, যেন হেসে ওঠে। ভাবখানা এই যে, কাল তো তোমার দশা দেখেছি। আজ আবার অত বড়াই কেন? ওই অস্ত্র আমাকে দিলে আমিও মুনজাকে শেষ করে দিতে পারি।

হাম্বীর জোরে হেসে ওঠে, বিজয়ের রসিকতা বোধ দেখে। বলে, তবু তো আমি লড়েছি। একবার ওঁর অস্ত্রে আঘাত হানতে পেরেছি। তাতেই উনি বললেন, আমি নাকি প্রকৃত রাজপুত। এর নাম বলে মায়ের ভালবাসা। বুঝলি রে বোকা?

মুনজার এলাকার মধ্যে এসে পড়ে হাম্বীর। খুব সাবধানী দৃষ্টিতে এগিয়ে চলে। পদে পদে বিপদ এখানে। মুনজার অনুচররা একবার তাকে দেখতে পেলে আদর আপ্যায়ন করবে না মোটেই। রাণা বংশের প্রতিটি মানুষকে তারা চেনে।

বনাঞ্চলে বাঁধা-ধরা পথ নেই সর্বত্র। পথ করে নিয়ে যেতে হয়। চলতে চলতে অদূরে শুকনো পাতার খস্ খস্ আওয়াজ হয়। লাগাম টেনে ধরে হাম্বীর। ঘোড়া কান খাড়া করে। কেউ দেখে ফেলল নাকি?

দেবীর দেওয়া তরবারি হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা। কত কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে এই অস্ত্রটিকে ঘিরে। সে হয়ত জানতেও পারবেনা কোনদিন।

এবারে আওয়াজ বেশ জোরে। কারা যেন ছুটে আসছে। হাম্বীর প্রস্তুত। আর সেই মুহূর্তে দুটি বন্য বরাহ সামনে দিয়ে তীব্র গতিতে চলে যায়।

হাম্বীর হেসে ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে বলে—তুই-ও আমার মতই সাহসী বিজয়।

গাছের ফাঁক দিয়ে কিছুটা দূরে একটি পাহাড়ের উপর দৃষ্টি পড়ে তার। সে শুনেছে ওখানে রয়েছে মুনজার আস্তানা। তরবারি কোষে ভরে রেখে সে বল্লম হাতে নেয়। এখানে তীর ধনুক ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ নেই।

ধীরে ধীরে গাছপালা ফাঁকা হয়ে আসে। পথও চওড়া হয়ে আসে। ওখানে আত্মগোপন করে চলার অসুবিধা। তবু যতটা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে সে এগিয়ে যায়। কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হতেই সে দেখতে পায় সামনে আর পেছন থেকে চারজন অশ্বারোহী তাকে ঘিরে ফেলেছে। বুঝতে পারে এত সাবধানতাও ব্যর্থ হল তার। এখানকার আত্মগোপনের স্থানগুলো মুনজার নখদর্পণে।

অশ্বারোহীরা সশস্ত্র। এই মুহূর্তে সে অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। সামনে-পেছনে দুদিকেই শত্রু। ওরা সংখ্যায় বেশী। ওদের সবাই একদিকে থাকলে কিছুটা সুবিধা হত। হাম্বীর চায় ওদের সবাইকে তার সামনে আনতে। সে অপেক্ষা করে। ওরা আক্রমণ না করলে সে-ও কিছু করবে না।

অশ্বারোহীরা একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়। মুনজাকে হাম্বীর কখনো দেখেনি। কিন্তু তার যা বর্ণনা শুনেছে তাতে বুঝতে পারে সামনের দুজনার মধ্যে বলিষ্ঠ এবং বয়স্ক ব্যক্তিটিই মুনজা।

সেই ব্যক্তি বিদ্রূপের স্বরে বলে—নমস্তে রাজপুত্র। আপনি কি হাওয়া খেতে বার হয়েছেন ?

—তোমার কি মনে হয় ? একা একা যুদ্ধযাত্রা করেছি ?

—বলা যায় না। চিতোরগড়ের রাণাদের রক্তে নানান দোষ। মুরোদ না থাকলেও তাই অদ্ভুত অদ্ভুত সব সখ চেপে বসে ওদের মাথায়।

হাম্বীরের মাথায় রক্ত ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে শান্ত করে নিজেকে। রাগলে তার নিজেরই ক্ষতি।

সে হাসতে হাসতে বলে—কথাটা মিথ্যে বলনি। আমি বেরিয়েছি মুনজার আস্তানার খোঁজে। ইচ্ছে আছে, তাকে প্রশ্ন করব রাণার সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহারের কারণ কি ?

লোকটি মাথা অবনত করে বলে—কষ্ট করে আর যেতে হবে না। অধীন আপনার সম্মুখেই উপস্থিত। প্রশ্ন করুন।

—ও, তুমিই তবে মুনজা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার দাসানুদাস।

—বেশ। তবে বল কেন এভাবে বিবাদ বাধাচ্ছ।

—বলব বটে। তবে উত্তর শুনে রাজপুত্র ফিরে যাবার সুযোগ পাবেন না কিন্তু।

—একলা পেয়ে বন্দী করবে বুঝি ?

—না না। ওসব বন্দীটন্দী হল রাজাদের ব্যাপার। আমরা শেষ করে দিই।

—এতক্ষণে বুঝেছি। তা, একজন মানুষকে কতজন মিলে আক্রমণ করবে ?

—প্রথমে একজনই করবে। রাণা বংশের রক্তে কতটা তেজ রয়েছে একটু পরখ করে দেখে নিতে চাই। ক'দিন আগে একবার তো দেখলাম। মন খারাপ হয়ে গেল। এবারিও হয়ত একজনই যথেষ্ট। তবে তেজ বেশী হলে তিনজনে মিলে শুরু করব।

—কে লড়বে প্রথমে ?

মুনজা পেছনের একজনকে দেখিয়ে দেয়। হাম্বীর তার ঘোড়া একপাশে সরিয়ে নিয়ে লোকটিকে বলে—সামনে এসো তাহলে।

সে জানে যুদ্ধের কোনরকম নিয়মকানুন মানতে গেলে সে মারা পড়বে। এরা ওসবের ধার ধারে না। সেকথা মুনজা নিজেই কবুল করেছে। এ লোকটি যদি পরাস্ত হয় তবে ওরা তিনজনে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই যে কোন কৌশলে হোক এদের হত্যা করতে হবে।

পেছনের লোকটি সামনের দিকে যখন এগিয়ে আসতে থাকে, তখনই হাম্বীর ঠিক করে ফেলে, পেছনের অবশিষ্ট লোকটিকে আগে শেষ করে ফেলতে হবে। তাহলে ওদিক থেকে আক্রমণের আর ভয় থাকবে না। সব শত্রু সামনে থাকবে। সে লক্ষ্য করে মুনজা তার দিকে চেয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে।

হাম্বীর বল্লমটা শক্ত করে ধরে। লোকটি তার পাশ দিয়ে সামনে যাচ্ছে। এই সুযোগ। বিজয়কে পা দিয়ে ইঙ্গিত করতেই সে পেছনে ঘুরে দাঁড়ায়। হাম্বীর তার বল্লম ছুঁড়ে দেয়। অব্যর্থ লক্ষ্য। অবশিষ্ট ব্যক্তিটি ধরাশায়ী হয়। আর্তনাদ করারও সময় পায় না।

সামনের তিনজন পলকের জন্যে হতভম্ব হয়। কিন্তু তারপর একযোগে আক্রমণ করে। মুনজা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। হাম্বীর নিমেষে একপাশে সরে গিয়ে তরবারি দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাঁধে আঘাত করে। সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। তার ডান হাত প্রায় স্কন্ধচ্যুত। মুনজা বল্লম নিক্ষেপ করে। কিন্তু সেই বল্লম দ্বিতীয় ব্যক্তির ঘোড়ার পেটে গিয়ে বিঁধে যায়। ঘোড়াটি শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। আর সেই সুযোগে হাম্বীর ছুটে গিয়ে আর একজনের কোমরে আঘাত করে। সে চিৎকার করে ওঠে। তারপর আর্তনাদ করতে করতে ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

এবারে মুনজা একা। সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের যুদ্ধ সে জীবনে দেখেনি। বুকের ভেতরে তার কেঁপে ওঠে। তার হাতে বল্লম নেই। হাম্বীরের হাতেও নেই। দুজনারই হাতে অসি। মুনজা ভাবে একবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে নিজের আস্তানায় পৌঁছোতে পারবে। সেখানে তার অনেক লোক রয়েছে। হাম্বীরকে সহজে হত্যা করা যাবে।

সে পালাতে চেষ্টা করে। হাম্বীর তার ভাবভঙ্গি দেখে আঁচ করতে পেরেছিল। সে পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়।

—পালাতে পারবে না মুনজা। আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। দস্যুর সঙ্গে

কেউ যুদ্ধ করে না। তাই একা এসেছি তোমাকে হত্যা করতে। তোমার মুণ্ড কেটে নিয়ে গিয়ে রাণাকে উপহার দেব। পালাবে কোথায়?

মুনজা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—তুমি সাংঘাতিক।

—চিতোরগড়ের রক্ত রয়েছে বলছ আমার দেহে?

—আমাকে যেতে দাও। আমি এই এলাকা ছেড়ে চিরকালের মত চলে যাব। আর আমাকে দেখতে পাবে না কখনো। আমি কথা দিচ্ছি।

—আমিও কথা দিয়ে এসেছি রাণাকে। তোমার কাটা মুণ্ডু নিয়ে যেতেই হবে। ছাড়তে পারি না।

—আমি ভুল বুঝেছিলাম। রাণার বংশকে আমি চিনতে পারিনি আগে। আজ চিনেছি।

—প্রস্তুত হও মুনজা। তুমি কাপুরুষ নও। তুমি কাপুরুষের মত মরলে আমার দুঃখ হবে। আমি লড়তে চাই। তুমিও মেবারের প্রজা।

—না না। তোমার হাতের ওই তরবারি দেখে আমার বুক কাঁপছে। ওটা দিয়ে আগুন বার হচ্ছে। কী ভীষণ ওটা। আমায় যেতে দাও।

—না। আমি আক্রমণ করছি। তুমি রুখতে চেষ্টা কর।

কিন্তু রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না মুনজার। সে হাম্বীরের হাতের অসির দিকে ভীত বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে। ঠিক যেন বলির পাঁঠা। সেই ভাবেই সে প্রাণ দেয়।

ওদের চারটি অশ্বের মধ্যে একটি তখনো মুনজার বল্লমে আহত হয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। বাকী তিনটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। ওরা বুঝতে পারে না, এবারে ওদের কাজ কি।

হাম্বীর তার অশ্বটিকে বলে—ওদের ডেকে নে বিজয়। তোর সঙ্গে থাকবে।

মুনজার কাটা মুণ্ডু তারই বস্ত্রে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের পথে রওনা দেয় সে। তার পেছনে পেছনে তিনটি সওয়ার হীন অশ্ব চলতে থাকে।

কৈলওয়ারার মানুষ দেখল তাদের হাম্বীর ঘোড়ায় চেপে রাজধানীর পথ ধরে এগিয়ে আসছে।

তার পেছনে তিনটি ঘোড়া। সবাই জানত সে গিয়েছে মুনজাকে দমন করতে। এ কথাও তারা জানত একা গিয়ে মুনজাকে দমন করার কথা ভাবা বাতুলতা মাত্র। রাজপুত্র সাহসী বটে, তবে এখনো ছেলেমানুষ।

কিন্তু পেছনে ওই তিনটি ঘোড়া দেখে তাদের কৌতূহল বাড়ে। হাম্বীরের কাছে ভীড় করে,—এই ঘোড়া কাদের ?

হাম্বীর হেসে বলে—মুনজার দলের। ওই সাদা ঘোড়াটা মুনজার।

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একজন বলে—মুনজা কোথায় ? পালিয়েছে ?

হাম্বীর একটা কাপড়ের পোঁটলাতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ওদের চোখ আরও বড় বড় হয়ে ওঠে। তবু বিশ্বাস করতে মন চায় না ওদের। ভাবে, রাজকুমার ভুল করে মুনজা ভেবে অন্য কাউকে মেরে এনেছেন। ওকে মারা যদি অত সহজ হত তাহলে সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্বয়ং মহারাণা আহত হয়ে ফিরে আসতেন না।

তবু কথাটা সারা শহরে রটে যায়। সবাই ছুটতে থাকে রাজসভার দিকে। যদি সত্যই মুনজা হয় ?

শহরের লোক এসে ভেঙে পড়বার আগেই হাম্বীর রাজসভায় প্রবেশ করে। তার আগমন সংবাদ রাণা পান নি। তাই তাকে দেখে বিস্মিত হন।

—তুমি বলেছিলে কৃতকার্য না হলে ফিরবে না। তখনি বলেছিলাম সঙ্গে সৈন্যদল নিয়ে যাও। রাজপুতের প্রতিজ্ঞাকে তোমরা মূল্যহীন করে ফেলছ। তোমার কাছ থেকে অন্তত এমন আশা করিনি হাম্বীর।

—কৃতকার্য না হলে আমি ফিরতাম না।

—বলছ কি তুমি! বলতে চাও, মুনজাকে হত্যা করেছ ? একা গিয়ে ?

—হ্যাঁ, রাণা।

রাণা কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থাকেন। তারপর বলেন—প্রমাণ ? প্রমাণ না পেলে বিশ্বাস করি কিভাবে ?

হাম্বীর এগিয়ে যায় রাণার সামনে। সেখানে নতজানু হয়ে বসে বস্ত্রে জড়ানো মুনজার মুণ্ডুটি খুলে ফেলে।

মহারাণা অজয় সিং চমকে ওঠেন। এই লোকটিই তাঁকে আহত করেছিল। এই সেই দস্যু। কোন সন্দেহ নেই। তিনি আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন। ভুলে যান যে কিছুদিন আগে আহত হয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে হাম্বীরকে আলিঙ্গন করেন।

সভা নীরব। রাণা সবার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন,—আজ আমি আপনাদের সামনে একটা বিশেষ কিছু ঘোষণা করব। আপনারা মন দিয়ে শুনুন। কারণ এই ঘোষণার সাক্ষী আপনারা।

সেই সময়ে বাইরে গোলমাল শোনা যায়।

রাণা প্রশ্ন করেন—ও কিসের চিৎকার ?

হাম্বীর হেসে বলে,—ওরা বোধহয় মুনজাকে দেখতে এসেছে।

মহারাণার আদেশে দ্বাররক্ষী এসে মুনজার মুণ্ডু চুলসমেত ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল বাইরে।

রাণা বলেন,—আজ আমি, রাণা লক্ষ্মণ সিং-এর শেষ আদেশের কথা ঘোষণা করব। আপনারা সবাই জানেন পিতার আদেশে একদিন আমাকে চিতোরগড় ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু আপনারা জানেন না, চলে আসার সময় লক্ষ্মণ সিং কি বলেছিলেন। কেউ জানেন না। জানতেন একজন সর্দার আর এক চারণ কবি। ওঁরা দুজনাই হয়ত মৃত। বাকী রইলাম আমি একা। রাণা লক্ষ্মণ সিং-এর আদেশ অনুযায়ী আমি রাণা বংশকে জিইয়ে রাখলাম। কিন্তু আমার পর কে হবে রাণা? আমার পুত্রদের কেউ? রাণা লক্ষ্মণ সিং কি তাই চেয়েছিলেন?

একজন বলে ওঠে—তাছাড়া আর কি হতে পারে?

—না। লক্ষ্মণ সিং বিবেচক ছিলেন। আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ না করলে কে হত রাণা? আমি?

সবাই ঘাড় নাড়ে। অজয় সিং হতেন না বটে? কারণ তিনি দ্বিতীয় পুত্র।

—তবে? লক্ষ্মণ সিং জোর দিয়ে বলেছিলেন, আমার পরে মেবারের রাণা হবে আমার বড় ভাই অরি সিং-এর পুত্র। হ্যাঁ, এই হাম্বীর। আমার পিতার শেষ আদেশ।

সবাই নির্বাক। তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারত। কারণ হাম্বীর তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সে কথা আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু রাণা তাঁর দুই পুত্রকে একেবারে বঞ্চিত করলেন বলে দ্বিধা।

অজয় সিং বললেন,—আপনারা চুপ করে রইলেন কেন? আপনাদের কি আনন্দ হচ্ছে না?

বৃদ্ধ এক সর্দার কেশে নিয়ে বলে—আমাদের আনন্দ রাখার জায়গা নেই। কিন্তু আপনার পুত্রেরা? তাঁরা কি একেবারে বঞ্চিত হবেন?

—তাদেরই প্রশ্ন করুন। ওই তো রয়েছে। তারা কি সেনাপতি পদেরও যোগ্য?

ততক্ষণে হাম্বীর নিজে ভাইদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে,—ভাই হল অন্য জিনিষ! পরম আদরের। ভাই পাশে থাকলে অসীম বল পাওয়া যায় মহারাণা।

সুজন কিন্তু মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে—আপনি ঠিকই বলেছেন মহারাণা। আমরা মেবারের উপযুক্ত নই। আমাদের কেউ বলে দেয় নি কিভাবে মানুষ হব। দেখে শেখার মত বুদ্ধি আমাদের নেই। হাম্বীর সব দিক দিয়েই উপযুক্ত। ও

আমাদের ভালবাসে, তাই একথা বলছে। ওর কথা হয়ত সত্যি। কিন্তু আমরা মেবারে থাকব না। চলে যাব।

হাম্বীর প্রশ্ন করে,—কেন? কোথায় যাবে?

—দূরে। রাজস্থানের বাইরে। দক্ষিণে কোথাও।

কয়েক বছর কেটে যায়। চিতোরগড়ের স্বপ্ন হাম্বীর এখন বেশী করে দেখে। ভবানী তাকে শিখিয়ে দিয়েছে। ভবানী এখন আর কিশোরী নেই, সে তরুণী। আগের মত হাম্বীরের পেছনে লাগার চঞ্চলতা তার নেই। তবে কথাবার্তায় হাসির জোয়ার বইয়ে দিতে ছাড়ে না এখনো।

সেদিন অসময়ে মায়ের কক্ষের দিকে যেতে গিয়ে হাম্বীরের চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। সে দেখল ভবানী মেঝেতে বসে মায়ের জানু চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর মা তাকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ভবানীকে এর আগে হাম্বীর কখনো চোখের জল ফেলতে দেখেনি। এভাবে আকুল হয়ে কাঁদার কথা তো ভাবতেই পারে না।

সে মায়ের কাছে যাবে কিনা বুঝতে পারে না। শেষে ভাবে তার উপস্থিতি ভবানীকে সঙ্কোচের মধ্যে ফেলবে। তাই দুজনার অগোচরে স্থানত্যাগ করে। কিন্তু মনের মধ্যে তার প্রবলভাবে নাড়া দিতে থাকে। ভবানীর গ্রাম থেকে কোন দুঃসংবাদ আসেনি তো?

অনেক পরে সে আবার মায়ের কাছে যায়। মায়ের সঙ্গে নানা কথা বলে। সব সময়েই প্রত্যাশা করতে থাকে, ভবানীর বিষয়ে মা কিছু বলবেন। কিন্তু কিছুই বলেন না তিনি। অবাক হয় হাম্বীর। ভবানীর অত অশ্রুজলের সবটুকুই কি মূল্যহীন?

শেষে মাকে প্রশ্ন করে বসে—ভবানীর কী হয়েছে মা?

—কেন?

—তার কি মন খারাপ?

মা হাম্বীরের দিকে চেয়ে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলেন—সে কি কিছু বলেছে তোমাকে?

—না। তার সঙ্গে কোন কথাই হয়নি আজ।

—তবে কি করে বুঝলে মন খারাপ?

—সকালের দিকে যখন তোমার কাছে আসছিলাম, তখন ওকে কাঁদতে দেখলাম এখানে। তাই আর এলাম না।

মা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি বললেন,—ওর মাথায় পাগলামী চেপেছে।

হাম্বীর ভাবে এমনিতেই তো ওর মধ্যে যথেষ্ট পাগলামী রয়েছে। নতুন আবার কি চাপলো? সে মায়ের কাছে জানতে চায় কিসের পাগলামী।

—ওর বিয়ের সুন্দর একটা সম্বন্ধ করেছিলাম। তুমি তো জান ও চিতোরগড়কে কতখানি ভালবাসে। তাই দেখে শুনে সুরজ সিং- এর বড় ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করেছিলাম। ছেলেটির সুন্দর স্বাস্থ্য। তুমি তো জানই সে বেশ সাহসী। অস্ত্রবিদ্যায় খারাপ নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল চিতোরে ওদের সুন্দর বাড়ি রয়েছে। যদি কখনো আমরা চিতোর দখল করতে পারি তাহলে ভবানী ওখানে থাকতে পারত।

—বেশ ভালই-তো।

—ভবানী কিছুতেই রাজী নয়। সে বলেছে বিয়ে সে করবে না। একে পাগলামী ছাড়া আর কি বলব?

—তাইতো। কেন চাইছে না বিয়ে করতে?

—প্রতিজ্ঞা করেছে, চিতোর যতদিন দখল করা যাবে না, ততদিন সে অবিবাহিতা থাকবে। ওকে প্রথমে তিরস্কার করলাম। কড়া কথা শোনালাম। শেষে মিষ্টি কথা বলতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এ এক জ্বালা হল দেখছি।

—কি করবে তাহলে?

—ভাবছি, গ্রামে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—না না। ও এখানেই থাক। হয়ত দেখবে দুদিন পরে পাগলামী আর নেই।

—ওকে চিনলে না এখনো?

ভালভাবেই চেনে হাম্বীর। তবু ভবানী এখানে থাকবে না একথা ভাবা যায় না। একটা দিক ফাঁকা হয়ে যাবে। তাছাড়া ভবানী তাকে শুধু স্বপ্ন দেখতে শেখায়নি, সব সময় চিতোরগড়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তার ভবিষ্যতের সব কল্পনাকে আরও দৃঢ় করে তুলছে।

সেদিন অপরাহ্নে অশ্বশালার কাছে ভবানীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বুঝতে পারে হাম্বীর, নিজেকে সামলাবার জন্যে সারাদিন গা-ঢাকা দিয়ে ছিল সে। এখন সামলে উঠেছে তাই নতুন রসিকতার জাল বুনতে এসেছে।

—এই যে বীর হাম্বীর? কোথাও যাওয়া হবে নাকি?

—ভাবছি।

—সেকি? মনস্থির করতে পারোনি? তবে যেওনা।

—কেন?

—অমন দোমনা হয়ে কোথাও যেতে নেই।

—তোমার উপদেশের মাত্রা বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

—তাই বুঝি? বেশ, আর উপদেশ দেব না। তুমি এখন বড হয়েছ। তাছাড়া তুমি হলে মেবারের ভাবী মহারাণা।

—তাতে কি হল?

—আমার মত এক গ্রাম্য মেয়ের কথা সহ্য হবে কেন?

—ওসব কথা বলে আমাকে রাগিয়ে দিওনা বলছি।

—ও বাবা। রেগে যাচ্ছ নাকি? কেন? রাগের কি হল?

—তুমি জান আমাব মা তোমাদেবই গ্রামের মেয়ে। অথচ তিনি মেবারের শ্রেষ্ঠ রমণী।

হুঁ। ভেবে দেখাব মত কথা বটে।

—আসল কথাটা বলতো ভবানী। এসময়ে পেছনে লাগতে এসেছ কেন?

ভবানী কেমন যেন গম্ভীব হয়ে যায়। তার মুখ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। সে বলে,—তুমি ছেলেমানুষ তো। তোমাকে সব কথা বলা যায় না। নইলে নিশ্চয় বলতাম।

—আমি ছেলেমানুষ? তোমার চেয়ে বড হয়েও?

মৃদু হেসে ভবানী বলে—তাতে কি হল? তুমি যে পুরুষ। পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে ছেলেমানুষই থাকে।

—বাঃ বেশ নতুন কথা বলেছ তো? আর তুমি? তুমি বুঝি বুড়ি?

—তা তো বটেই।

—ওসব কথা থাক। কোন্ কথা বলতে চাও বল।

—হাম্বীর, ভাবতে পার আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে?

—হাম্বীর লাফিয়ে ওঠে। সে বুঝতে দেয় না কথাটা তার অজানা নয়। চিৎকার করে বলে,—এ্যা সত্যি নাকি? দারুণ খবর তো? কোথায় ঠিক হল?

ভবানী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হাম্বীরকে লক্ষ্য করতে থাকে। কিছুই বলতে পারে না।

হাম্বীর বলে,—কি হল? চুপ করে গেলে কেন? এমন সুসংবাদ একটুখানি বলে থেমে গেলে? তা হবে না। সবটুকু বলতে হবে। মুখের সামনে মিঠাই ধরে নাচিয়ে চলে গেলে হবে না।

ভবানী ভীষণ রেগে ওঠে, বলে,—সুসংবাদ নয়। বিয়ে আমি করছি না। কারও সাধ্য নেই জোর করে বিয়ে দেয়। তেমন হলে পালিয়ে যাব। হ্যাঁ গ্রামে পালিয়ে যাব।

অতিরিক্ত ক্রোধে ভবানীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে।

হাম্বীর তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। শান্ত কণ্ঠে বলে,—আমি বুঝিনি ভবানী তোমার আপত্তি আছে। তাহলে আগ্রহ প্রকাশ করতাম না।

—কোন কিছু না বুঝে অমন বাঁদরের মত লাফাতে নেই।

হাম্বীর হেসে ফেলে। বলে,—আমাকে বাঁদর বললে? জান, আমি মেবারের ভাবী মহারাণা?

—জানি। সেই জন্যেই বলছি যে মেবারের রাণার একটা কিছু শুনেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠা কিংবা দুঃখে মুষড়ে পড়া উচিত না। সবটা শুনে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

—ঠিক বলেছ। বেশ আমি স্বীকার করছি আমি বাঁদর।

ভবানী চট করে হাম্বীরকে প্রণাম করে নিয়ে বলে,—ক্ষমা চেয়ে নিলাম। শোধবোধ।

—আচ্ছা, এখন বলতো তোমার আপত্তি কেন?

—চিতোর উদ্ধারের আগে আমি বিয়ে করব না।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু তখন যদি তোমার বিয়ের বয়স আর না থাকে?

—ও, তুমিও?

—আমি কী?

—কৈলওয়ারাতে নিশ্চিন্তে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও?

—কে বলল সেকথা?

—তবে কেন ওকথা বললে? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তুমি না বীর হাম্বীর?

—হ্যাঁ। চিতোর আমি উদ্ধার করবই। কিন্তু ওপক্ষের প্রতিরোধের কথা ভাবছ না কেন?

—যতই প্রতিরোধ আসুক। ভেঙে চুরমার করে দেবে।

—বেশ, তাই হবে। তুমি যখন বলছ।

—আমার কথার এত গুরুত্ব!

—তোমার কথার গুরুত্ব নেই? এসব বলছ কি ভবানী? আমিও যে স্বপ্ন দেখতে শিখেছি।

—শোন হাম্বীর। তুমি হয়ত স্বপ্ন দেখো। কিন্তু আমি যা দেখি তা স্বপ্ন নয়। সেই বিধবা মেয়েটিকে কাল দেখলাম। বড় হয়েছে। ওর জন্যে এখনো প্রাণ কাঁদে। মুখখানা বিষণ্ণতায় ভরা। ইচ্ছে হয় হাসি ফুটিয়ে তুলি। অথচ ও সেই বিশ্বাসঘাতক মালদেও-এর কন্যা।

হাম্বীর কিছু বলে না। সে বুঝতে পারে ভবানীকে বিয়েতে রাজী করানো অসম্ভব। তাতে উল্টো ফল ফলবে।

রাণা অজয় সিং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বয়স তাঁর হয়েছিল বটে, তবে স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল না। কিন্তু মুনজার কাছে আহত হবার পর থেকে এই কয় বছরে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি সকলেই লক্ষ্য করছিল। মাঝে মাঝে মাথায় যন্ত্রণা হত। রাতে ভাল ঘুম হত না।

এবারে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ল। সবাই বুঝতে পারল, এমন কি রাণা নিজেও, যে মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসতে খুব বেশি দেরি নেই।

সেই সময় এক নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুজন সিং খুব সাবধানে রাণার কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। কক্ষের বাইরে বাতায়নের কাছের গাছে একটি ঘুঘু একটানা ডেকে চলছিল। সুজন জানে না রাণা ঘুমিয়ে রয়েছেন কিনা। ঘুমোলে ব্যাঘাত করবে না।

কিন্তু সে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা থেকে প্রশ্ন ছুটে এল,—কে, কে তুমি?

সুজন কাছে এসে দাঁড়াল! বলল,—আমি। সুজন?

—ও। সুজন। তুমি এখন হঠাৎ?

ক্ষণেকের তরে চুপ করে থেকে সুজন বলে,—আমি বিদায় চাইতে এসেছি। আমাকে বিদায় দিন।

—বিদায়? কোথায় বিদায় দেব? কি বলছ তুমি সুজন!

—আপনার হয়ত মনে নেই, হাম্বীরকে যেদিন আপনি মেবারের ভবিষ্যৎ মহারাণা বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেইদিনই আমি আর অজিন রাজস্থান ছেড়ে দূরে চলে যাব বলেছিলাম।

—হ্যাঁ বলেছিলে বটে। কিন্তু সে তো মুখের কথা সুজন। মন থেকে কেউ দেশ ছেড়ে যেতে পারে?

—আমি পারছি। আজই যাব।

—ও! তুমি যাবে। কোথায় যাবে শুনি। অজয় সিং হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

—দক্ষিণ ভারতে।

—আর তোমার সেই ভাইটি? সেও কি যাচ্ছে? নাকি মত পালটেছে?

—আপনি জানেন না?

—কি জানব?

—অজিন বেশ কিছুদিন ধরে ভীষণ অসুস্থ।

—অজিন অসুস্থ? অথচ আমি জানি না? আমি যখন মেবারের মহারাণা, দেশের প্রতিটি খবর সব চাইতে আগে আমার জানা দরকার। অথচ নিজের পুত্রের অসুস্থতার খবরটুকুই কেউ আমাকে দিতে পারল না? বুঝেছি, এখন থেকে সবাই মিলে আমাকে বাতিলের দলে ঠেলে দিয়েছে।

—না পিতা। আমার মনে হয় তার একান্ত ইচ্ছাতেই আপনাকে কেউ জানায় নি। তার মত একজন ঘৃণ্য ব্যক্তির জন্যে আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হবেন—সে চায় না।

—কিন্তু সে আমার সন্তান।

—না না মহারাণা। ওকথা ভুলে যান। আমাদের দুজনার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা মনে রাখবেন না। শান্তি পাবেন।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাণা ডাকেন—সুজন।

—রাণা।

—আমার মৃত্যুর কি খুব বেশী দেরী আছে বলে তোমার মনে হয়?

সুজন নীরব। সে জানে, যে কোন সময় মহারাণার জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হতে পারে।

—কথা বলছ না কেন? শোন, শেষটুকু দেখেই যাও।

সুজন দাঁড়িয়ে থাকে। তবু কিছু বলে না। সে তার যাত্রার সময় স্থির করে ফেলেছে। কোন বাধাই মানবে না।

—সুজন, কিছুদিন পরে যেও। হয়ত দু-একটা দিন।

দৃঢ়কণ্ঠে সুজন বলে,—এখন তা আর হয় না। সব ঠিক করে ফেলেছি।

—তার মানে আমার শেষকৃত্যটুকু তুমি এড়িয়ে যেতে চাও। সত্যি বল। তুমি রাজপুত।

—আপনি ঠিক বলেছেন মহারাণা। সেই অধিকার একমাত্র হাম্বীরের।

—ও।

রাণা অজয় সিং চোখ বন্ধ করেন। সুজন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। কিন্তু তিনি চোখ খোলেন না। সুজন বুঝতে পারে রাণা তার সঙ্গে আর কথা বলতে চান না। তিনি তাকে ভুল বুঝলেন। এই ভুল নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন। তিনি জানলেন না, মুনজাকে যখন হত্যা করতে বলেছিলেন সে তখন কিশোর। এখন সে তরুণ। তার তারুণ্য তার মানসিকতার আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। শৈশবে হাম্বীরের মত তার মনে কেউ আদর্শের প্রদীপখানি জ্বালিয়ে দেয়নি। সেই আদর্শ সে নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলেছে। পিতা বুঝলেন

না। কেউ বুঝল না।

সুজন ঘর ছেড়ে বার হয়। তার পদশব্দ মিলিয়ে যেতে অজয় সিং চোখ খোলেন। তাঁর চোখ বেয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ে।

তিনি দুর্বল কণ্ঠে দু-একবার ডেকে ওঠেন,—সুজন—সুজন। সে ডাক কারও কানে পৌঁছোয় না।

কিছুদিন পরে আর একটি প্রচণ্ড আঘাত রাণার মৃত্যুকে তরান্বিত করে। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অজিন সিং এক সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

সে নাকি দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল। রাজবৈদ্যরা বারবার তার চিকিৎসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে তাদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। ফিরিয়ে দিয়েছে প্রতিবার।

অজয় সিং সবই বুঝলেন। অভিমানে দুই পুত্র তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। যাক তিনিই বা আর ক'দিন।

বিড়বিড় করে বলেন,—আমিও যাচ্ছি রে অজিন। ওখানে মেবার নেই, চিতোরগড় নেই, দিল্লীও নেই। ওখানে আরাবল্লী নেই, মরুভূমি নেই, চম্বল নেই। ওখানে তোকে আমি আদর করব। সব স্নেহ ঢেলে দেব। অপদার্থ বলে তোদের আমি গালি দিয়েছিলাম। বড় কষ্ট হয়েছিল তোদের। বুঝি, সব বুঝি। কিন্তু আমার চেয়ে অপদার্থ আর কেউ নেই একথাও মর্মে মর্মে জানি।

কে যেন কক্ষের ভেতরে একটা ক্ষীণ বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সেই আলোয় রাণার চোখের সামনে একটি একটি করে ছবি ফুটে উঠল, আবার মিলিয়ে গেল। দেখলেন, তাঁর দাদা অরি সিং শিকারে চলেছেন। পরক্ষণেই দেখলেন ভ্রাতারা অস্ত্র শিক্ষা করছে আর অদূরে বসে পিতা সহাস্যে তাই দেখছেন। সহসা শুনলেন আলাউদ্দিনের রণভেরীর আওয়াজ। তারপর প্রজ্বলিত হুতাশনের লেলিহান শিখা তীব্র বেগে ধাবিত হয়ে আকাশকে গ্রাস করতে চাইল। জহরব্রত।

তিনি চিৎকার করে ওঠেন,—তুমি যেও না। আমি এখনো মরিনি। আমি বেঁচে আছি। এই দেখ—এই দেখ।

কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। এটি কৈলওয়ারার প্রাসাদ কক্ষ। তাঁর মহিষী এই মুহূর্তে অন্য কোথাও রয়েছেন।

রাত আরও গভীর হয়। মহিষী এক সময়ে পথ্য খাইয়ে চলে গিয়েছেন। খেয়াল নেই রানার। তিনি একলা থাকতে চান। তাই মহিষী এলেও অন্য এক শয্যায় হয়ত শুয়ে পড়েছেন।

সেই সময় আবার ছবি ফুটে উঠতে থাকে রাণার সামনে। একি! এ কোন্ মাতৃমূর্তি? চেনা চেনা মনে হচ্ছে?

—কে আপনি?

—চিনতে পারছ না? ভুলে গেলে?

—হ্যাঁ চিনেছি। চিনেছি মা। চিতোরগড়ের মন্দির কতদিন দেখিনি। সে সাধ পূর্ণ হল না।

—তুমি তোমার কর্তব্য পালন করেছ অজয় সিং। আর কিছুই করার ছিল না। দুঃখ করো না।

—আমার অজিন।

—অজিন? সে তো শান্তি পেয়েছে। তার জন্যে ভাবছ কেন? আর সুজন চলেছে এক মহান বংশের ভিত্তি স্থাপন করতে। তোমরা তাকে কাপুরুষ ভাবলেও সে তা নয়। সে বীর—মহান। তার বংশধরেরা একদিন এই বিশাল ভারতভূমিতে এক বিরাট শক্তির উৎস হবে। সারা ভারতে গৈরিক পতাকা হাতে নিয়ে মারাঠা জাতি হিসাবে আধিপত্য বিস্তার করবে। তোমাদের রাজস্থানও সেই শক্তির অধীনতা স্বীকার করবে। তবে সেই দিন আসতে অনেক দেরি।

—এই কি তোমার আশীর্বাদ মা? মেবারের সূর্য অস্তমিত হবে?

—তুমি অজয় সিং, মেবারের রানা। কিন্তু তোমার মেবার সারা ভারতের তুলনায় কতটুকু? তোমার দেশ মহান ভারতবর্ষ। মেবার একটা অংশ মাত্র। কত জাতির দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষ এই ভারতকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। হিন্দু-মুসলমান কিছুই থাকবে না। সবার এক পরিচয়—ভারতবাসী।

—এও কি সম্ভব? সবাই ভারতবাসী? তাহলে সেইদিন যে বড় সুখের হবে।

—তাই হবে অজয় সিং।

ঘোড়া ছুটিয়ে চলছিল মেবারের রাণা। কৈলওয়ারা তার রাজধানী হলেও মেবারের রাণা এখন হাম্বীর। অজয় সিং-এর মৃত্যুর পর অবিসংবাদিত নেতা। দিল্লীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখন তার ওপর। সে জানে তার গতিবিধির ওপর অনেক ছদ্মবেশী গুপ্তচর আর বিশ্বাসঘাতক কড়া নজর রাখে। তবু সে একা চলে এসেছে গুপ্ত পথ দিয়ে। এ পথের সন্ধান কেউ জানে না। তাছাড়া সে চলেছে ছদ্মবেশে।

রওনা হবার সময় মা কিছু না বললেও ভবানী বলেছিল যে মেবারের রাণার কোথাও নিঃসঙ্গ অবস্থায় যাওয়া উচিত নয়। তার নিরাপত্তা আর সম্মানের জন্যেই এ-প্রশ্ন ওঠে। কথাটা মিথ্যে বলেনি ভবানী। কিন্তু যেখানে যাচ্ছে, সেখানে লোকজন নিয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না।

হাম্বীর চলেছে সেই চারণ কবির কাছে। কতদিন হয়ে গেল, যাওয়া আর হয়নি। এই হল উপযুক্ত সময়। এরপর হয়ত সময়ই পাবে না। ভবানী যেভাবে চেপে ধরেছে, চিতোর উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা না করলে চলে না। অবিশ্যি ভবানী কিছু না বললেও তার একমাত্র লক্ষ্যও তাই। তবে ভবানী বড় বেশী ব্যস্ত করে তোলে। ও তো জানে না এর পেছনে কত কিছুর আয়োজনের দরকার।

চলতে চলতে অনেক দূরে চলে আসে সে। একবার পূর্বদিকে চেয়ে দেখে। ওই দিকে পাহাড়ের আড়ালে কোন এক স্থানে রয়েছে তার স্বপ্নের চিতোরগড়। ওটিকে দখল করতেই হবে। আলাউদ্দিনের পর মহম্মদ এখন দিল্লীর সুলতান। তার হয়ে চিতোর শাসন করছে এখন মালদেও। সে-ও রাজপুত। বংশমর্যাদা তারও রয়েছে। শুধু নেই দেশপ্রেম। দেশপ্রেম থাকলে নিজের স্বার্থে অন্যের অধীনতা স্বীকার করতে পারত না। দেশপ্রেম যার রয়েছে সে অপর এক দেশপ্রেমী গোষ্ঠীর মাতৃভূমিকে নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করে না।

হাম্বীর ভালভাবেই জানে, মালদেও পুরুষানুক্রমে চিতোরগড় ভোগদখলের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলেছে। কিন্তু তা হতে দেবে না সে। মালদেওর স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। এই সমতলই মেবার রাজ্যের চিরকালের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। এখানে উৎপাদিত শস্য মেবারকে বাঁচিয়ে রাখে, তার রসদ যোগায়—ঐশ্বর্যশালী করে তোলে তাকে। বড় কষ্টের এই ফসল। প্রকৃতির অনেক বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে এই ফসলকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়—ঘরে তুলতে হয়।

দূরে একটা গ্রাম দেখা যায়। ওই গ্রাম পার হয়ে আবার পর্বত। অনেকটা অগ্রসর হবার পর গ্রামের সরু অস্পষ্ট পায়ে চলার পথ পাওয়া যায়। শিকারে আসার কিংবা কাঠ সংগ্রহের রাস্তা এটি। নিশ্চিন্তে চলতে থাকে হাম্বীর। চলতে চলতে নানান্ কথা ভাবতে থাকে। তার অভিষেকের দিনের কথা মনে পড়ে।

অজয় সিং-এর মহিষী সেই অনুষ্ঠানে কিছুতেই যোগ দিতে চাননি। না না, পুঞ্জীভূত কোন দুঃখের জন্য নয়। তিনি ভেবেছিলেন, বিধবা হয়ে মঙ্গল অনুষ্ঠানে

যোগ না দেওয়াই হয়ত ভাল হবে। কিন্তু মা তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে। তাঁর আশীর্বাদ না পেলে অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। বলেছিলেন, তিনিও তো বিধবা। কিন্তু আশীর্বাদ করার জন্যে হাত তুলেই মহিষী এক সুগভীর দীর্ঘশ্বাস রোধ করতে পারলেন না। মা চমকে উঠেছিলেন সেই শব্দে। অজয় সিং-এর মহিষী কেঁদে উঠেছিলেন। বলেছিলেন,—তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমার মনে অন্য কোন আশা নেই। শুধু একটি আশা ছিল, সুজন থাকবে মেবারের রাণার পাশে, বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে। সেই আশা পূরণ হল না। তোমরা না জানলেও আমি জানতাম হাম্বীরই হবে মেবারের রাণা। মা নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—তোমার আশীর্বাদে হাম্বীর যেন সুজনকে ফিরে পায়।

আরও কিছুটা পথ অতিক্রমের পর অশ্বের পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠে হাম্বীর। দেবীপ্রদত্ত অসির ওপর হাত রাখে। শব্দ আসছিল সামনের দিক থেকে। বেশ ছুটে আসছিল। একটু পরেই অশ্বারোহীকে দেখতে পাওয়া যায়। হাম্বীরকে দেখেই সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাশ টেনে থেমে যায়। তার দৈহিক গঠন আর অশ্বচালনার কৌশল দেখে হাম্বীর মুগ্ধ না হয়ে পারে না। হয়ত লোকটি গুপ্তচর, কিন্তু উঁচুদরের যোদ্ধা সন্দেহ নেই।

অশ্বারোহী প্রথমে এক চোট হো হো করে হেসে নেয়। হাম্বীর সতর্ক হয়। অশ্বারোহীকেও সতর্ক বলে মনে হয়। সে আরও একটু এগিয়ে আসে। হাম্বীরের থেকে মাত্র চার হাত দূরে দাঁড়ায়। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামে। আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায়।

বিস্মিত হাম্বীর সহজভাবে বলে,—আমাকে দেখে অত বিনয়ের ঘটা কেন?

আগন্তুক মৃদু হেসে বলে,—আমাদের বংশের কারও চোখে ধুলো দেওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয় মহারাণা। ছদ্মবেশেও নয়।

রাণা স্তম্ভিত। প্রশ্ন করে,—কে তুমি?

—আমি লাল সিং। আপনাকে সশরীরে দ্বারের প্রান্তে দেখতে পাব, কল্পনা করিনি কখনো।

—আগে কোনদিন আমাকে দেখেছ?

—হ্যাঁ। অভিষেকের দিনে। ওই দিনটিতে আমরা সাধ্যমত উপস্থিত থাকার চেষ্টা করি।

—কেন?

—ওই দিনে আমরা নতুন মহারাণাকে দেখে চিনে রাখি। আমাদের বংশের

এই ধারা। আমার বাপ-ঠাকুর্দারাও তাই করেছেন।

হাম্বীর অবাক হয়। সে এমন একটি পরিবারের খবর জানে না। এমন কত পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সারা মেবারে। চিতোরগড়ে ফিরে যেতে পারলে তাদের হদিশ মিলবে।

—তুমি কোথায় চলেছ লাল সিং?

—যাচ্ছিলাম কৈলওয়ারাতে। আর প্রয়োজন হবে না। সমস্ত মেবারই এখন আমার সামনে।

—আমাকে চিনতে ভুল হলো না কেন?

—জানি না রাণা। এই গুণ বোধহয় আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

—আশ্চর্য।

—কিন্তু আপনি একা? এতে যে অনেক বিপদের সম্ভাবনা। কোথায় চলেছেন মহারাণা?

—ওই দূরের পাহাড়টায়। ওখানে রয়েছেন এক চারণ কবি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।

—ওই পাহাড় খুবই দুর্গম। ওখানে মানুষ আছে বলে শুনিনি কখনো।

রাণা হেসে বলে—আছেন। আমি নিজে কয়েক বছর আগে গিয়ে দেখে এসেছি। তবে এখন বেঁচে আছেন কিনা বলতে পারি না।

—আমাকে সঙ্গী করে নেবেন মহারাণা?

হাম্বীর ভাবে মন্দ কি? তারই সমবয়সী। যুদ্ধে পারদর্শী। যোগ্য সঙ্গীর সমস্ত গুণই রয়েছে। কিন্তু মুখের কথায় তো মানুষ চেনা যায় না। লাল সিং কতটা বিশ্বস্ত কে বলতে পারে? হয়ত গুপ্তচর বলেই তার ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও চিনতে পেরেছে।

হাতের বর্শা ইচ্ছে করে মাটিতে ফেলে দেয় হাম্বীর। লাল সিংকে সামনে ঝুঁকে পড়ে সেটি তুলে নিয়ে আক্রমণের সুযোগ করে দেবার বাসনা ছিল। কিন্তু আগেই লাল সিং ব্যস্ত হয়ে সেটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে তার রাণার হাতে দিয়ে খুবই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে।

—তুমি অবাক হলে বলে মনে হচ্ছে লাল সিং?

—হ্যাঁ রাণা। আপনার হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল?

—তাই তো দেখছি।

—না না। মুখে শুধু একবার বলুন আপনি ইচ্ছে করে ফেলেছেন। তাহলে শান্তি পাব। রাণার হাত থেকে অস্ত্র পড়ে যাওয়া—না না, একবার শুধু বলুন।

—কেন? পড়ে যেতে নেই?

—না। রাণার হাত অত দুর্বল নয়। রাণা অতটা অসাবধান হতে পারেন না।

হাম্বীর অন্যমনস্কতার ভান করে পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে আর একটি সুযোগ করে দেয় তাকে আক্রমণের। তবু লাল সিং নীরব। তার মুখখানা ব্যথায় ভরে উঠেছে। সে যেন সইতে পারছে না এই ছোট্ট ঘটনাটি। জবাবের প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে।

হাম্বীর বলে,—তোমার অনুমান সত্য লাল সিং। ইচ্ছে করেই ফেলেছিলাম।

—কেন মহারাণা?

—দেখলাম তুমি বিশ্বাসী কিনা। তুমি তো গুপ্তচরও হতে পারতে। আমাকে হত্যা করার সুযোগ দিয়েছিলাম তোমাকে।

লাল সিং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে রাণার সামনে জানুপেতে বসে নিজের বল্লম তার পায়ের সামনে রেখে বলে,—আমাদের বংশের অস্ত্র চিরকাল সূর্য বংশের কাছে সমর্পিত।

চারণ কবি বেঁচে আছেন এবং বেশ জোর দিয়ে বললেন, বেঁচে থাকবেনও। মুক্ত চিতোরগড় দেখে তবে মরবেন। এতদিন পরে হাম্বীরকে দেখে তিনি চিনতে পারেন নি। ছদ্মবেশই তার মুখ্য কারণ। ছদ্মবেশ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সহর্ষে আলিঙ্গন করলেন। তবু তিনি জানতেন না, স্বয়ং মেবারের রাণা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। জানতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বলতে গেলে, তাঁর মুখে যে বিষাদের ছায়া চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছিল, হাম্বীর রাণা হয়েছে শুনে সেই বিষাদ কোথায় মিলিয়ে গেল।

খুশী হয়ে আবার তিনি একই কথা বললেন,—স্বাধীন চিতোরগড়ে তোমার সঙ্গে দেখা হবে হাম্বীর। আমি যতই বৃদ্ধ হই না কেন, আগে মরছি না। দেখে নিও।

কথাটা শুনে হাম্বীরের মনে হল, একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা পরম নিশ্চিন্তে তিনি তার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। ভবানী তাকে প্রায় প্রতিদিনই প্ররোচিত করেও এতখানি দায়িত্ববোধ জাগাতে পারেনি।

দু-চার কথার পর কবি হাম্বীরের সঙ্গী লাল সিং-এর পরিচয় জানতে চাইলেন। হাম্বীর নিজেও ভালভাবে জানে না লাল সিংকে। তাই লাল সিং নিজের পরিচয় নিজে দিল। তার পরিচয় পেয়ে কবি গান গেয়ে উঠলেন। আজকে তাঁর গানের গলা আরও মিষ্টি আরও দরাজ। এই গান তাদের

উভয়কে আবিষ্ট করে রাখল।

শেষ হলে হাম্বীর জিজ্ঞাসা করে,—এই গানের অর্থ ?

—লাল সিং বুঝবে। ওর প্রপিতামহ অসাধারণ শৌর্য প্রকাশ করে যুদ্ধে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি এখন নিশ্চয় ভানুলোকের বাসিন্দা। কিন্তু মর্ত্যে এই গান তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

লাল সিং-এর চোখে রীতিমত বাষ্প জমতে শুরু করেছিল। সেটা লক্ষ্য করে হাম্বীর ফিস্‌ফিস্ করে তাকে বলে,—অশ্রু দেখলে কবি ক্ষেপে উঠবেন লাল। তাড়িয়েও দিতে পারেন। সাবধান।

লাল সিং তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে নেয়।

অনেকক্ষণ ধরে গল্প হয়। লাল সিং পিপাসার্ত হয়ে ওঠে। তাকে জল এনে দেবার জন্যে কবি উঠতে যেতেই হাম্বীর বলে,—উঁহু। আমি মেবারের রাণা। আমার হুকুম সব জায়গায় চলবে।

চারণ কবি হো হো করে হেসে ওঠেন। তারপর বলেন,—বেশ তো। তা তোমার হুকুমটা কি শুনি ?

হাম্বীর বলে,—আমার হুকুম হল, আপনারা উঠবেন না। জলপাত্রটি দিন।

জলপাত্র নিয়ে হাম্বীর জল আনতে গেল। লাল সিং-এর মাথায় ঢুকলো না, হাম্বীর বুঝল কি করে কোথায় জল আছে।

চারণ কবি বলেন,—আগের বার জলের খোঁজে এসেই আমার সন্ধান পেয়েছিল।

শেষে বিদায় নেবার সময় হয়। চারণ কবি বলেন,—একটা কথা তোমাকে বলি হাম্বীর। তুমি ফিরে গিয়ে ভাল করে ভেবে দেখতে পার।

—বলুন।

—আমি রাজনীতি করি না। হয়ত আমি নির্ভুল নই। তবু এই অরণ্যে বসে থেকে থেকে অনেক চিন্তাই আমার মাথায় আসে। তার একটি তোমাকে বলছি। শুনতে খারাপ লাগবে না তো ?

—আপনার সব চাইতে খারাপ কথাও আমার কানে মধুবর্ষণ করবে।

চারণ কবি হাসেন। তিনি বলেন,—সমতলে যত রাজপুত রয়েছে তাদের নিয়ে গিয়ে জড়ো কর তোমার রাজধানীর আশেপাশে।

হাম্বীর চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

—কি ? অদ্ভুত শোনাচ্ছে তো ?

—হ্যাঁ। ওরা খাবে কি ? পাহাড়ে তো শস্য হয় না।

—জানি। মজুত শস্য যতদিন আছে চলবে। তারপর বেশ কষ্ট হবে। তবে ওরা কেউ অলস নয়। ওদের হাত পা রয়েছে। কয়েক মাসের জন্যে টিকে থাকতে পারবে নিশ্চয়। আর এতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সাফল্য এসে তোমার দরজায় ঘা দেবে।

হাম্বীর ভাবে, চারণ কবির এ-ও এক কল্পনা। বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে কত না ফারাক।

তবু সে বিনয়ের সঙ্গে বলে,—ঠিক বুঝতে পারছি না। এতে লাভ কি হবে?

—সমতলভূমিতে শস্য ফলবে না। যোদ্ধা থাকবে না একজনও। চিতোর দুর্বল হয়ে পড়বে। মালদেও তখন মরিয়া হয়ে তোমার ওপর আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করবে। এই সুযোগে তুমি তাদের ধ্বংস করবে। কারণ ওদের তরফে প্রকৃত যোদ্ধা বলে কিছু নেই। তোমার যোদ্ধারা থাকবে পাহাড়ের আনাচে কানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে। বাধ্য হয়ে মালদেও তোমার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসবে।

হাম্বীর আশান্বিত হয়ে ওঠে। এ শুধু কল্পনাবিলাস নয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার বলিষ্ঠতা।

সে বলে,—কিন্তু কে ওদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে আমার বার্তা? এমন একজনকে চাই যার কথা ওরা সহজেই বিশ্বাস করবে। কেই-বা সংগঠিত করবে সমতলের রাজপুতদের?

—কেন? এই লাল সিং। এ নিজেও জানে না এর শক্তির পরিচয়। কিন্তু আমি জানি। এদের বংশ পরিচয় আমার জানা। এদের এমন এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে।

লাল সিং সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তার প্রত্যয় হয় সে পারবে। নিশ্চয় পারবে। চারণ কবি সঠিক পথ বাৎলে দিয়েছেন। চিতোরগড়ের উড়ে এসে জুড়ে বসা শাসনকর্তা জব্দ হবে।

সে বলে,—আমি পারব। আমি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে রাণার বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেব। আমি জানি তারা সবাই রাণার অনুরক্ত। প্রকৃত রাজপুত কেউ-ই মালদেওকে মনে মনে সহ্য করতে পারে না। তবু তারা চুপ করে রয়েছে, কারণ তাদের কাছে কোন নির্দেশ গিয়ে পৌঁছোচ্ছে না।

ওরা দুজনা ফিরে আসে রাজধানীতে। হাম্বীর লাল সিংকে সোজা নিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে হাজির। মা তাকে দেখে এবং তার পরিচয় পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হন। মায়ের সন্তুষ্টিতেই হাম্বীরের সব চাইতে বেশী আনন্দ।

লাল সিং বিদায় নিলে ভবানী সামনে আসে। বলে,—মানুষটা মন্দ নয় বীর হাম্বীর। একে কি সেনাপতি করবে ভাবছ?

—সেসব পরের কথা। তার আগে এর মস্ত কাজ রয়েছে একটি।

মা শুনতে আগ্রহী হন। হাম্বীর চারণ কবির বক্তব্য মাকে খুলে বলে। সে লক্ষ্য করে চারণ কবির প্রতি মায়ের অপরিসীম শ্রদ্ধা।

তারপর উঠে আসার সময় হঠাৎ মাকে প্রশ্ন করে,—এটা তো ফাল্গুন মাস। তাই না মা?

—হ্যাঁ।

—কত তারিখ?

—পাঁচ।

—ঠিক আছে। ঘোষণা করে দিচ্ছি এবারে ফাগ উৎসব হবে। আট তারিখে ফাগ উৎসব না?

—হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ উৎসব কেন হাম্বীর?

—এখানে কোন উৎসবই তেমন ভাবে পালন করা হয় না। বয়স্ক লোকদের কাছে চিতোরের আনন্দ উৎসবের কথা শুনে মন বড় খারাপ হত। আমার মত সবারই হয় জানি। তাই একটু চিতোরের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাই।

—পারবে তো?

—দেখি।

ভবানী হেসে ওঠে।

হাম্বীরের মা বলেন,—হাসলে যে?

—মহারাণা কার সঙ্গে খেলবেন? আসল লোকটি তো এখনো আসেনি!

হাম্বীর বুঝতে পারে ভবানীর ইঙ্গিত। প্রাসাদের ভেতরে রাণীদের নিয়ে মহারাণার ফাগ খেলার প্রথা রয়েছে একটা। সে বলে,—আমারটা না হয় না হল

এবার। তবে তোমার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। সুরয সিংকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তার ছেলের সঙ্গে দুহাত মিলিয়ে দেব।

হাম্বীর বেশ গাম্ভীর্য সহকারে কথা কয়টি উচ্চারণ করে। ভবানীর মুখ রক্ত শূন্য হয়ে যায়। সে হাম্বীরের মাকে চেপে ধরে।

তিনি হাম্বীরকে তিরস্কার করতেই সে ছুটে বার হয়ে যায়। সে ভুলে গিয়েছিল যে কথাটা মা তাকে ভবানীর অজ্ঞাতে বলেছিলেন। ভবানীর ধারণা ছিল হাম্বীর এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। মেয়েটার ফ্যাকাশে মুখের কথা ভেবে কষ্ট হয় তার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আর কখনো ভবানীকে আঘাত দেবেনা সে।

শহরবাসী সবাই ফাগ উৎসব সম্বন্ধে মহারাণার ঘোষণার কথা শোনে। শুধু শহরে নয় আশেপাশের সব পাহাড়ে খবরটা রটে যায়। বহুদিন পরে একটা উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্যে সবার মন নেচে ওঠে।

আট তারিখে সারা শহর রঙীন হয়ে ওঠে—সেই সঙ্গে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই। দূর এবং কাছের বন জঙ্গল থেকে যারা এসেছিল তারাও মেতে ওঠে। অবরুদ্ধ মন অনেকদিন পরে মুক্তি পেয়ে কি করবে ভেবে পায় না। হাম্বীরও রয়েছে তাদের মধ্যে। তার সর্বাঙ্গ রঙীন। গাছে গাছে যে সব ফুল ফুটে রয়েছে তাদের সুগন্ধে দেহ-মন মাতোয়ারা। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় কৈলওয়ারার মানুষেরা।

অবশেষে সবাই এসে জড়ো হয় প্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গণে। এখানে হোলি খেলা শুরু হয়। ঘোড়ায় চড়ে প্রথমে লাল সিং এগিয়ে আসে মহারাণার সঙ্গে খেলতে। তারপর একে একে অনেকে। সবাই অশ্বারোহী।

প্রবল উত্তেজনা। সবাই ভাবে এতদিন এই প্রাণ চাঞ্চল্য ছিল কোথায়? মনে হত, রাজপুত মরে গিয়েছে। কিন্তু তাতো নয়। দিব্যি বেঁচে রয়েছে তারা। তবে কেন তারা এখানে পড়ে থাকবে? ফিরে যাবে চিতোরগড়ে। শত্রুর সব বাধা ছিন্নবিছিন্ন করে দেবে।

হাম্বীরের উদ্দেশ্য সফল হল।

সে ঘোষণা করল,—এবার থেকে সব উৎসবই আমরা পালন করব। আমাদের অর্থবল ততটা নয়। কিন্তু আনন্দ করতে দোষ কি? তারপর চিতোরে ফিরে গিয়ে শুরু হবে আমাদের জীবন।

সবাই চিৎকার করে ওঠে,—মহারাণা হাম্বীরের জয়।

হোলির পর লাল সিং আর অপেক্ষা করল না। সে বেরিয়ে পড়ল সমতলের গ্রামগুলোর দিকে। এও এক ধরনের অভিযান। প্রচার অভিযান। সঙ্গী বলতে শুধু তার বাহন অশ্বটি।

প্রতিটি কৃষক, প্রতি সর্দারের কাছে সে পৌঁছে দিতে শুরু করল রাণার অভিপ্রায়ের কথা। মন দিয়ে শুনল সবাই। লাল সিং-এর চেহারা, তার ব্যক্তিত্ব আর বলার ধরণে কেউ আকৃষ্ট না হয়ে পারল না। তবু অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে তারা দ্বিধা বোধ করল। এতদিনের বাসস্থান এক কথায় পরিত্যাগ করা সহজ নয়। লাল সিং কিছুদিন ঘোরাফেরার পর উপলব্ধি করল, এদের এই মানসিকতার মূল কারণ অনেক বছর রাণার অস্তিত্বের প্রমাণ তারা পায়নি। তাদের কানে এখনো প্রতিধ্বনিত হয় চিতোর দেবীর কণ্ঠস্বর, ম্যায় ভুখা হুঁ। তাদের এখনো ধারণা দেবী রক্ত চান।

তবু লাল সিং একটুও দমে না। সে জানে কার্যোদ্ধার তাকে করতেই হবে। সারাদিন খেয়ে না-খেয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। আর রাত হলে কারও দাওয়ায় কিংবা কোন গাছতলায় শুয়ে পড়ে।

এইভাবে একটানা অমানুষিক পরিশ্রমের পর একটু একটু করে ফল ফলতে শুরু করল। লাল সিং নিজের চোখেই দেখতে পেল কাঁধে লাঙল আর উট এবং গরু মোষ নিয়ে একটি দুটি চাষী পরিবার এগিয়ে চলেছে কৈলওয়ারার দিকে। দেখে আনন্দে নেচে উঠল তার মন। চিৎকার করে তরবারি আকাশে উঁচিয়ে বলে,—তোমাদের স্বার্থত্যাগ শিগ্‌গিরই সফল হবে। মহারাণা তোমাদের সহায়। সারা মেবার তোমাদের সহায়।

একরাতে সে কোন এক গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিল। বাড়ির মালিক একজন যুবক। সে খুব আদর আপ্যায়ন করল লাল সিংকে। তৃপ্ত লাল সিং একটি পৃথক ঘরে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানে না। একসময়ে তার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে চলেছে। অন্ধকারে প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পারে না। তারপর অবাক হল রমণীর ভীত কণ্ঠস্বরে।

—কে ?

—আপনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন। পালান শিগ্‌গির।

লাল সিং একলাফে উঠে পড়ে। পাশ থেকে তরবারি টেনে নেয়। বুঝতে পারে যুবকের ভগিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলে,—কেন? পালাব কেন?

—দাদা লোক ডাকতে গিয়েছে। আপনাকে খুন করবে।

—খুন করবে? কেন? আমার অপরাধ?

—আপনি যে রাণার লোক। দাদা চিতোরের মালদেও-এর ছেলে বনবীরের অধীনে কাজ করে। পালান।

—যাচ্ছি। মরতে চাইনা কখনই। অনেক কাজ বাকী। কিন্তু তুমি তো দাদারই বোন। বাঁচাতে চাইছ কেন আমাকে?

—আপনি আমাদের রাণার লোক বলে।

—ও। কতজন লোক আনবে?

—জানি না। আপনার পায়ে পড়ি চলে যান। আমার বুক কাঁপছে।

—ঘুমন্ত মানুষকে খুন করতে খুব বেশী লোকের দরকার হয় না। তাছাড়া সবাই খুনী হতে পারে না। পারলে তোমার দাদাই শেষ করে দিতে পারত আমাকে। আমি যাব না। আমি দেখতে চাই মেবারের লোক হয়েও কি করে এত জঘন্য হতে পারে তোমার দাদা।

—না না।

—তুমি কাঁদছ কেন? কান্নার কিছু নেই। তুমি শুয়ে পড়ো গে।

মেয়েটি আকুল হয়ে লাল সিংকে চেপে ধরে বলে,—চলে যাও। আমার প্রার্থনা। তুমি চলে যাও!

—ও। বেশ যাচ্ছি। কিন্তু তোমার কোন অনিষ্ট হবে না তো?

—বলতে পারছি না। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—তোমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যাব? তাই কখনো হয়?

—আমার যত বিপদই হোক, প্রাণ যাবে না।

লাল সিং অশ্বটিকে খুলে এনে তার ওপর চেপে বসে বলে,—আমি যাচ্ছি বটে, তবে বেশী দূরে নয়।

যুবতী উত্তেজিত হয়ে তার উরুতে চপেটাঘাত করতে করতে বলে,—তুমি পাগল। তাই এইসব বলছ। তুমি কিছুই বুঝতে পার না। একজন মেয়ের অনুরোধ রাখার মত ভদ্রও তুমি নও। তুমি জংলী।

আর এক দণ্ডও অপেক্ষা করে না লাল সিং। ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। তার মনের কুলে কিসের একটা ঢেউ বারবার আছড়ে পড়তে থাকে। তারই অনুরণন চলে বহুক্ষণ ধরে। জীবনে এমন কখনো হয়নি।

অন্ধকারের মধ্যে অনেকটা দূরে গিয়ে একটা গাছের গোড়ায় অশ্ব থেকে নামে। সেখানে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রাত কাটাতে থাকে। মাঝে মাঝে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে। কিন্তু নিজেকে সজাগ করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। বলা যায় না যুবতীর ভাই ব্যর্থ হয়ে তার অনুসন্ধানে বার হতে পারে।

শেষে ভোর হয়। তখন আবার চলতে শুরু করে সেই একই বাড়ির দিকে। অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটিকে ভাল করে দেখাই গেল না। গলার স্বর অত মিঠে, চেহারা কেমন? অথচ চোখের জল বোধহয় দেখতে পেয়েছিল। তাই বা কি করে সম্ভব হল? চোখের জল কি অন্ধকারেও দেখা যায়? কিংবা তারার আলো প্রতিফলিত হয়েছিল সেই অশ্রুকণায়? বুঝতে পারে না লাল সিং।

বাড়ির সামনে গিয়ে যখন উপস্থিত হয় তখন ভালরকম বেলা হয়েছে। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েই সে এসেছে। তবে সে জানে, দিনের আলোয় নগ্নভাবে তাকে কেউ আক্রমণ করতে সাহসী হবে না। কারণ এ গ্রামের সবাই রাণার অনুগত। রাতের অন্ধকারে যারা গুপ্তহত্যা করতে চায় দিনের আলোয় তারা বিবরে গিয়ে মুখ লুকোয়।

বাড়িটার সামনে এসে লাল সিং তার ঘোড়ার সঙ্গে আপন মনে কথা বলতে থাকে। তারপর জোরে জোরে কাশে। তার সাধনা সফল হয়। ছুটতে ছুটতে বার হয়ে আসে যুবতী। কিন্তু তাকে দেখেই থতমত খেয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর লজ্জায় রাঙা হয়ে ছুটে ভেতরে চলে যায়। কিন্তু তাতেই লাল সিং-এর চোখ সার্থক হয়। তার অনুমান মিথ্যে নয়। কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গত রেখে তরুণীর চেহারাও লাবণ্যময়।

লাল সিং বুঝতে পারে যুবতীর দাদা অনুপস্থিত। নইলে লজ্জায় রাঙা হবার বদলে রক্তশূন্য দেখাত তাকে। তার মন আরও হালকা হয়ে যায় এই ভেবে যে ওর দাদা ওকে সন্দেহ করেনি। বুকের বোঝা নেমে যাওয়ায় সেখানে অন্য ধরনের আলোড়ন শুরু হয়।

লাল সিং আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু মেয়েটি কোথায় যেন গিয়ে লুকিয়েছে। অপেক্ষা করে লাল সিং। তবু বার হয় না।

সে বলে ওঠে,—ভেবেছিলাম দুটো খেতে পাব। যা খিদে পেয়েছে। ভাগ্যে নেই দেখছি। যাই অন্য কোথাও—

মেয়েটি ছুটে বাইরে চলে আসে। লাল সিং-এর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

লাল সিং বলে,—একটু জল পাবো ?

যুবতী অস্ফুট স্বরে বলে,—কিছু খাওয়া হয়নি তো। রুটি বানিয়ে দিচ্ছি।

—না বাবা। অত সখের দরকার নেই। শেষে তোমার দাদা এসে রুটি সমেত গলাটা কেটে দিক।

যুবতী উৎসাহিত হয়ে বলে,—দাদা তো নেই।

—কেন ? কোথায় গেল ?

—ভোরবেলায় চিতোরগড় রওনা হয়েছে।

লাল সিং দুহাত তুলে কয়েকবার লাফিয়ে নেয়। তারপর বলে,—খুব বাঁচা গেল। এবারে তাহলে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল রাতে তুমি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলে।

সে দাওয়ার ওপর সটান শুয়ে পড়ে।

যুবতী হেসে ফেলে তার ধরণ-ধারণ দেখে। সে বলে,—আমি এখুনি রুটি বানিয়ে আনছি।

—না।

—কেন ?

—কি করে তোমার হাতের রুটি খাব ? তোমার নামই তো জানিনে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখে শান্তশ্রী। সেবার প্রতিমূর্তি।

সে আবার বলে,—আমি যাই।

—বেশ। তাহলে আমি এই উঠলাম।

—না।

—তবে নাম বল আগে।

—আমরা গরীব ঘরের মেয়ে। আমাদের নাম শুনে কি লাভ ? আপনারা রাণার লোক। সেখানে কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে।

—ও। তাই বুঝি ? তোমরা রাণার লোক নও ?

—আমরা রাণার প্রজা। তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। তাঁর সঙ্গে মেশার কথা আমাদের কেউ ভাবতে পারে ?

—আমি কোথাকার লোক জান ?

—কৈলওয়ারার।

—না। গ্রামের। রাণার সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে। কিন্তু তুমি শুধু এই জন্যেই নিজের নাম বলবে না ?

—আপনি এসেছেন নিজের কাজে। আবার চলে যাবেন। নাম শুনে

কি হবে? আপনাকে আমি উপবাসী রাখতে পারি না। রাণার কাজ করছেন।

—শুধু তাই? বেশ, খেতে দাও। ভেবেছিলাম তোমার এখানে বারবার আসব। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। কিন্তু তুমি চাওনা যে আমি আসি। ঠিক আছে। রুটি এনে দিয়ে তোমার কর্তব্য কর। আমিও খেয়ে চলে যাই।

—আমি আসতে মানা করলাম কোথায়?

—করেছ। এখন কথা ঘোরালে কি হবে?

মেয়েটি কেঁদে ফেলে।

—বাঃ। আমি কান্নার কথা একটাও বলেছি? আমি কি জানতাম যে নাম জিজ্ঞাসা করা অন্যায়? যে প্রাণ বাঁচিয়েছে তার নাম জিজ্ঞাসা করা অপরাধ? কৃতজ্ঞতায় ওই নাম সারা জীবন জপও তো করতে পারি।

—আমি তো বলছি আমার নাম লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী। কত বলব?

সে ওড়নায় মুখ চেপে ছুটে ভেতরে চলে যায়।

লাল সিংও অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলে চলে, লক্ষ্মী লক্ষ্মী লক্ষ্মী। তারপর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই লক্ষ্মী তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সে যত্ন করে লাল সিং-এর খাবার দেয়।

খাওয়া শেষ হলে লাল সিং বলে,—লক্ষ্মী-লক্ষ্মী-লক্ষ্মী, এবারে আমি চলি।

লক্ষ্মীর চোখ দুটো ছলছল্ করে ওঠে। তবু কর্তব্য বড় কঠোর। মোহের জালে জড়িয়ে পড়লে চিতোর উদ্ধার হবে না।

লাল সিং বলে,—তোমার কাছে ফিরে এলে চিনতে পারবে তো?

—পারব।

—ভুলে যাবে না?

—ভোলে না কেউ।

—আমি আসব লক্ষ্মী। বেঁচে থাকলে ঠিক আসব। তখন মুখ ঘুরিয়ে নিওনা।

মেবারের যে সমতল ভূমি কৃষকদের উদয়াস্ত পরিশ্রমে শস্যশ্যামলা হয়ে থাকত,

আজ তা মরুভূমির মত ধূ ধূ করে। জনপদ বলতে কিছু নেই। তত্ত্বাবধানের অভাবে কুটিরগুলি ভেঙে পড়েছে। সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে বন্য বরাহ, শৃগাল আর সাপ।

মালদেও প্রথমটা অত খেয়াল করেনি। তার কানে এসেছিল, কৃষকরা জমিজমা ছেড়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। শুনে সে হেসেছিল। যাবে কোথায়? কে দেবে খেতে? পেটের জ্বালায় দুদিন পরেই ফিরে আসতে হবে। মাথাটি বিকোনো রয়েছে জমির কাছে।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করে। কেউ ফিরে আসছে না। বরং দু-চারজন যারা অবশিষ্ট ছিল তারাও যাত্রা করেছে অরণ্যের দিকে। আর এদিকে মাঠে ফসল বোনার দিন সত্যই শেষ হয়ে এল। এর পরে ফসল বুনে লাভ নেই আর। কি হবে উপায়? রাজ্যের মানুষেরা খাবে কি? দুদিন পরেই যে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে।

চারণ কবি সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলেন। মালদেও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। কি করবে ভেবে পায় না। লোকের মুখে লাল সিং-এর নাম শুনেছে সে অনেকবার। প্রথমে তাকে বন্দী করা কিংবা হত্যা করার অনেক চেষ্টা হল। ফল ফলল না। দেখা গেল গ্রামবাসীরাই লাল সিংকে আড়াল করে রাখে। মালদেও তখন আর একটু মরিয়া হয়ে উঠল। সে বেশ কিছু গুপ্তচর পাঠালো হাম্বীরকে হত্যা করতে। তার জানা ছিল হাম্বীর অন্যান্য রাজা মহারাজাদের মত নয়। সে রাজা হিসাবে নিজেকে পৃথক করে রাখে না প্রজাদের কাছ থেকে। সবার সঙ্গে মেশে। সে একাই বনে জঙ্গলে চলে যায়। তার দেহরক্ষী বলে কেউ নেই।

মালদেও-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হাম্বীরকে পাওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে সে লক্ষ্য করল যাকেই পাঠায় সে আর ফিরে আসে না চিতোরগড়ে।

মালদেও রাগে চিৎকার করে,—এরা সব বিশ্বাসঘাতক। আমার খায় পরে আর হাম্বীরের আরাধনা করে।

একজন বৃদ্ধ বলে,—বিশ্বাসঘাতক কোথায় রাজা? ঠিক কাজই তো করে।

—কি বললে?

—বলছি ওরা আপনার নুন কতদিন খাচ্ছে? ওদের চোদ্দপুরুষ যে সূর্য-বংশের রাণাদের নুন খেয়ে খেয়ে মজে গিয়েছে।

—রাজার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় এই বুড়ো বয়সেও শেখনি? আর কখনো এমন কথা শুনলে রাজ্য থেকে বার করে দেব। বুঝলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজা। আর কখনো এমন কথা বলব না। রাজ্য থেকে বার করে দিলে এই বয়সে না খেয়ে মরে যাব।

—হ্যাঁ মনে থাকে যেন।

এরপর মালদেও সিদ্ধান্ত নেয়, যুদ্ধ করতে হবে হাম্বীরের সঙ্গে। ওর আর কতটুকু সঙ্গতি? দুদিনেই ভেঙে পড়বে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার ভুল ভেঙে যায়। সৈন্যবাহিনী প্রতিবারই প্রচণ্ড মার খেয়ে ফিরে আসে। নিহত আর আহতের সংখ্যা দিনদিনই বেড়ে যায়। অথচ হাম্বীরের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। হাম্বীরের পাহাড়গুলোতে অগুনতি মানুষ। তারা মূষিকের মত নানান্ দিক থেকে বার হয়ে এসে মালদেও-এর বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে।

ওদিকে দিল্লী থেকে সুলতান মহম্মদের বারবার তাগিদ আসে খাজনার জন্যে। কিন্তু কোথায় অর্থ? শুধু চিতোরগড় নিয়ে তো মেবার রাজ্য নয়। তার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ খাঁ খাঁ করছে।

শেষে বাধ্য হয়ে মালদেও তার কৌশলের পরিবর্তন করে। দেখল, হাম্বীরের সঙ্গে বিবাদ করে সে মোটেই লাভবান হবে না। বরং তার ভরা ডুবি তরান্বিত হবে। তার চাইতে মিষ্টি ব্যবহারে তাকে তুষ্ট রেখে কার্যোদ্ধার করাই ভাল হবে। ভবিষ্যতে সুযোগ একদিন আসবেই।

ফলে কৈলওয়ারার রাজপথে একদিন এক সুবেশ প্রবীণ ব্যক্তিকে সুদৃশ্য নারকেল ফল হাতে দেখা গেল।

নাগরিকদের মনে কৌতূহল জাগে, কোথা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এল? কার বিয়ের সম্বন্ধ? লোকটি সাধারণ নয় মোটেই। তবে কি কোন রাজা মহারাজা পাঠিয়েছেন? নারকেলের গা সোনা আর রূপোর সুদৃশ্য কারুকার্যময় পাত দিয়ে মোড়া। মহারাণার জন্য সম্বন্ধ আসেনি তো?

দু একজন এগিয়ে এসে প্রশ্নই করে বসে।

লোকটির জবাবও স্পষ্ট। বলে,—চিতোরগড় থেকে এসেছি। রাও মালদেও-এর কন্যার সঙ্গে রাণা হাম্বীরের বিবাহের প্রস্তাব।

অবিশ্বাস্য এই প্রস্তাবের কথা শুনে সবাই বিস্মিত হয়। রাও মালদেও ভেবেছে কি? রাণার রাজধানী দখল করে রেখেছে সে। দিনের পর দিন যুদ্ধ করেছে। শেষে এখন মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব? লোকটা রাণার সামনে গিয়ে হাজির হলে, তিনি রেগে কিছু না করে বসেন। তবে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা। দূতের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করার মত মানুষ তিনি নন। বয়স কম হলে কি হবে।

একজন ফোড়ন কেটে বসে,—শুধু রাজকন্যায় মন ভুলবে না ভাই। যৌতুক স্বরূপ রাজ্যটি দিলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিব্রত ব্যক্তিটি কোন কথা বলতে পারে না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় রাজসভার দিকে। আর তার পেছনে চলে নগরবাসীর একটি ভারী দল। মজা দেখতে চলেছে তারা। মালদেও ঘটক পাঠিয়েছে। পৃথিবীতে এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কিছু হতে পারে?

তাকে প্রবেশ করতে দেখে প্রথমে সভার সবার মুখে আগ্রহ ফুটে ওঠে। তারা ভাবে রাজপুতানার কোন শক্তিশালী রাজা হয়ত এই নারকেল পাঠিয়েছেন। তাহলে মেবারের রাণার এতদিনে একটা বড রকম সহায় হবে।

মহারাণার সামনে লোকটি দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায়। তারপর সে হাম্বীরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ভুলে যায় দূত হিসাবে প্রথমে এসেই পরিচয় প্রদান করতে হয় এবং তারপরে আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে হয়। সে ভাবে, চেহারা বটে একখানা। সূর্যবংশে জন্ম না হলে এমন চেহারা হয়?

—কে তুমি!

চমক ভাঙে দূতের। সে হাম্বীরের সামনে নারকেলটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থাপন করে প্রস্তাব জানায়। আর তাতেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

সভার প্রতিটি ব্যক্তি চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাও মালদেও যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে এমন একটি চাল চালবে ভাবতেও পারেনি।

দূতকে বিশ্রামের জন্যে পাঠিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সবাই একবাক্যে নারকেল গ্রহণের বিরোধিতা করে। প্রত্যেকেই নিজের মতের সমর্থনে বেশ জোরালো যুক্তি দেখায়। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যায়। রাণা হাম্বীর সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। সবাই ভাবে দূতকে এখনি বিদায় দেওয়া হবে।

কিন্তু হাম্বীর বলে,—আমি নারকেল গ্রহণ করব ভাবছি।

লাল সিং বলে ওঠে,—না না মহারাণা। কিছুতেই নয়।

—শোন লাল সিং, আপনারা সবাই শুনুন। আপনাদের প্রত্যেকের ওপর আমার বিরাট আস্থা। আপনাদের যুক্তিও অকাট্য। কিন্তু আমারও একটি যুক্তি রয়েছে। সেই যুক্তি সম্ভবত আপনাদের মত মজবুত হবে না। কারণ তার সঙ্গে খানিকটা হৃদয় মেশানো রয়েছে। আপনারা খুব ভাল ভাবেই জানেন, রাজপুতদের জীবন অনিশ্চয়তায় ভরা। আজ যে যুদ্ধে রীতিমত আহত, কালই তার মাথায় রাজমুকুট শোভা পেতে পারে। আজ যে সুখে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করছে, দেখা যায় কালই সে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সত্যি কিনা?

কথাটা স্বীকার না করার কোন কারণ নেই।

—তাই আমি অনিশ্চয়তাকেই বেছে নিতে চাই। চিতোর আক্রমণের মত শক্তি সঞ্চয় করতে আমাকে আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু এটি একটি সুযোগ। চিতোরের দুর্বলতা দেখতে পাব আমি। ওখানকার প্রাসাদ-রক্ষীদের মনোভাব জানতে পারব। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা মালদেও তার নিজের জামাতার প্রতি চরম ব্যবস্থা নিতে পারবে না কিছুতেই।

লাল সিং বলে,—কিন্তু জামাতা হবার সুযোগ যদি সে না দেয়? যদি এই প্রস্তাব ছলনা হয়?

—আমি জানি এতে মস্ত ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু ঝুঁকি ছাড়া পৃথিবীতে কোন্ বড় কাজটা হয় লাল সিং?

—মনে রাখবেন মহারাণা, রাজপুত্র সুজন সিং চলে যাবার পরে সূর্যবংশের আপনিই শেষ ব্যক্তি।

—সূর্য কখনো চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয় না লাল সিং। সে সাময়িক ভাবে অস্ত যেতে পারে। আমি ঠিক করেছি চিতোরে যাব। আপনারা জানেন চিতোরগড় দেখার জন্যে মনে মনে আমি ছটফট করি। ওখানে প্রাসাদে, পথে কত কীর্তিকাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। আমি চোখ দুটো সার্থক করব দেখে। আমাকে আপনারা বাধা দেবেন না। ওখানে আমার আপনাদের সবার পূর্ব পুরুষের অস্থি মজ্জা মিশে রয়েছে। ওখানে তাঁরা জন্মেছেন, দিন কাটিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন। কি দুর্নিবার আকর্ষণ। আমি যাব।

সবাই চুপ করে শোনে। হাম্বীর আরও অনেক কিছু বলে যায়। তার প্রতিটি কথায় বাকী সবার প্রতিবাদের দুর্গ ভেঙে পড়তে থাকে।

হাম্বীর যেন স্বপ্ন দেখে চলে। আর তার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

নারকেল ফল গ্রহণ করা হয়।

মা রাতের বেলা ডেকে পাঠান হাম্বীরকে। বলেন,—কাজটা কি ভাল করেছ?

—আমি জানিনা মা। আমি চিতোর না দেখে থাকতে পারছি না। কতবার তোমার কাছে অনুমতি চেয়েছি ছদ্মবেশে একবার গিয়ে দেখব বলে। তুমি অনুমতি দাওনি। জানি তুমি ঠিকই করেছিলে। ছদ্মবেশেও সবার কাছে লুকিয়ে থাকা যায় না।

—আমি তোমার বিপদের কথা ভাবছি না হাম্বীর। সম্ভবত কোন বিপদ নাও ঘটতে পারে। কারণ ঢাক ঢোল পিটিয়ে কোন রাজপুত গুপ্তহত্যা করবে না।

মালদেও যত খারাপই হোক সে রাজপুত। রাজপুত নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে এমন কাজ করে না। হয়ত বন্দী করে রাখতে পারে কিছুদিন। সুবিধাজনক সর্তে ছেড়ে দিতে পারে।

—তবে তুমি কোন্ কথা বলছ মা?

—মালদেও-এর কন্যাকে বিয়ে করবে? সেই কন্যার গর্ভের ছেলে হবে মেবারের ভবিষ্যৎ রাণা?

—মালদেও-এর বংশমর্যাদা রয়েছে মা।

—শোন হাম্বীর। আমি জানি তুমি এখন অনেক যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করবে। কারণ চিতোরগড় একবার চোখে না দেখে শান্তি পাচ্ছ না। কিন্তু সব সময় মনে রেখো নিজের শান্তির চেয়ে রাজ্যের মঙ্গল অনেক বেশী অভিপ্রেত। তুমি স্বার্থপর হয়ে উঠেছ।

—আমাকে ভুল বুঝো না মা। চিতোরগড় আমার মনকে অশান্ত করলেও আমার উদ্দেশ্য হল সেখানকার সবকিছু জেনে আসা। তাতে আক্রমণের সুবিধা হবে।

—যদি সত্যিই মালদেও-এর কোন কন্যা থাকে, আর তার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়, তখন কি স্ত্রীর পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে? ভেবে বল।

—ভাবতে হবে না মা। চিতোরগড় সবার ওপরে। আমি সব পারব।

—বেশ।

—কিন্তু তুমি ওকথা বললে কেন মা?

—কোন্ কথা?

—বললে, যদি সত্যিই কোন কন্যা থেকে থাকে? তোমার কি ধারণা এই প্রস্তাব মস্ত একটা ধাপ্পা?

—ভবানী বলে, মালদেও-এর কন্যা নেই। একজন বিধবা কন্যা রয়েছে মাত্র।

—ওর কথা ছেড়ে দাও। হাম্বীরের মুখে অবহেলার ভাব ফুটে ওঠে।

সেই সময় ভবানী ছুটে আসে,—কি বললে বীর হাম্বীর? আমার কথা মিথ্যে? বিবাহের জন্য এতই লালায়িত তুমি?

মা বলেন,—আঃ ভবানী। কি বলছিস তুই?

উত্তেজিত ভবানী বলে,—আমি ঠিক বলছি। বেশীদিনের কথা নয়, পদ্মিনী নামে এক নারীর জন্যে চিতোরগড় আমাদের হাতছাড়া হয়েছে। এবারে বোধ-হয় মেবারের রাণা হাতছাড়া হবার সময় হয়েছে আর এক কল্পিত নারীর জন্যে। নারী—নারী—নারী। মেবারের আর সূর্যবংশের ইতিহাসে এ এক

নতুন উপসর্গ।

হাম্বীর ধৈর্য হারায়। বলে,—চুপ কর ভবানী। যথেষ্ট হয়েছে। তোমার চিতোর উদ্ধারের স্বপ্নকে আমি মানতে রাজী। কিন্তু সেই স্বপ্ন যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় সেখানে আমার সম্মতি থাকতে পারে না।

—কি বললে? মাত্রা ছাড়িয়ে যায়? আমার স্বপ্ন? কোথায় মাত্রা ছাড়ালো? কখনো তো বলনি সেকথা?

—তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি বলে। নইলে কৈলওয়ারার প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে চিতোরগড়ের অন্তঃপুরের ঘটনা-প্রবাহ কেউ দেখতে পায় না। লোকে পাগল ভাববে।

ভবানীর সমস্ত উত্তেজনা মুহূর্তে কোথায় বিলীন হয়ে যায়। তার সর্ব অঙ্গ একবার শুধু সামান্য ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। সে বিবশ অবস্থায় অসহায়ের মত পাশের কপাট চেপে ধরে। নইলে হয়ত পড়ে যেত।

—আমাকে ভুল বুঝোনা ভবানী। তুমি নিজেই ভেবে দেখো বুঝতে পারবে। এমন হওয়া হয়ত অস্বাভাবিক নয়। অদম্য ইচ্ছা আর অতিরিক্ত আগ্রহ চোখের সামনে বোধহয় এমন সব ছবি ফুটিয়ে তোলে।

ভবানী কিছু বলতে পারে না। তার ওষ্ঠদ্বয় থরথর করে কেঁপে ওঠে শুধু।

মা ভবানীর কাছে গিয়ে তাকে ধরে বলেন,—ওর কথায় কষ্ট পাচ্ছিস কেন? ওরা পুরুষ মানুষ। মন বুঝে কথা বলার মত কোমলতা ওদের কাছে আশা করতে নেই। ওরা কষ্ট দেবার জাত।

স্নেহের উত্তাপ পেয়েই বোধহয় ভবানীর চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ে। সে বলে,—আমাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিন। আমি গ্রামে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে হাম্বীর বলে,—তুমি গ্রামে গেলে আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করব।

—না তা হয় না। রাজপুত একবার কথা দিলে সেকথা ফিরিয়ে নেয় না। তুমি বীর হাম্বীর। তুমি ঠিকই করেছ। আমরা অতি সাধারণ গ্রামের মেয়ে। কি বুঝি?

—তুমি গ্রামে যেতে পারবে না।

ভবানীর মুখে অদ্ভুত ধরনের এক হাসি ফুটে ওঠে। বলে,—বেশ তো। আমি গ্রামে যাব না। আমি এখানেই থেকে যাব চিরকাল। শত হলেও এই কৈলওয়ারাতেই বীর হাম্বীর মহারাণা হয়েছে।

ক'দিন ধরে সবাই মিলে চিতোর যাত্রার আয়োজন শুরু করে দেয়। লাল সিং-এর উৎসাহ ততটা নেই। চিতোরগড় দেখার প্রলোভন থাকলেও, সে যেন হাম্বীরের এই সিদ্ধান্তকে মন দিয়ে মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই। তার সব চাইতে বেশী ভয় রাণার নিরাপত্তার ব্যাপারে। শত্রুপুরীতে একা রানাকে থাকতে দেবার কথা ভাবতেই তাঁর গা শির্‌শির্‌ করে ওঠে। সম্পূর্ণ ওদের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে রাণাকে। তার ওপর মালদেও-এর প্রস্তাবে রাজী হয়ে রাণা যেন নিজেকে অনেক খাটো করে ফেলেছেন।

তবে আদেশ পালন করাই তাদের বংশ পরম্পরার কর্তব্য। তাই কোন প্রশ্ন তোলেনি সে। শুধু মাঝে মাঝে রাণাকে শত্রু বেষ্টিত চিতোরগড়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

হেসে হাম্বীর জবাব দিয়েছে,—কিছু ভয় নেই লাল সিং। ওই পুরীতে গিয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দেহে একশো হাতীর বল ভর করবে। ওরা আমাকে আক্রমণ করলেও রুখতে পারবে না। ঠিক বেরিয়ে আসব। দেখে নিও।

—এ আপনার কল্পনা।

—সে কথা একেবারে মিথ্যা না। তবে কল্পনা সব সময়েই বাস্তবকে রূপায়িত করে।

—অসম্ভব কল্পনাও?

—হ্যাঁ। এখন আর কোন প্রশ্ন তুলো না। চিতোরগড় থেকে ফিরে এলে তুলো।

—যদি ফিরে আসেন, তাহলে তো চুকেই গেল সব।

হাম্বীর হেসে বলে,—তবে চুপ করে কাজ করে যাও।

তাই লাল সিং সবার সঙ্গে কাজ করে যায়। কিন্তু একটা সর্তে। সে হাম্বীরকে রাজী করিয়েছে যে তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবে।

দুদিন পরে রাতের শেষ প্রহরে ঘুম ভেঙে যায় হাম্বীরের। বন্ধ কপাটের বাইরে থেকে মা ডাকছেন তাকে। কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা।

চমকে ওঠে হাম্বীর। মায়ের কি হল? সে শয্যা ছেড়ে উঠে ছুটে গিয়ে কপাট খোলে।

—হাম্বীর। চল্।

মা রীতিমত গম্ভীর। মুখ থম্‌থমে। যেন কান্না রোধের চেষ্টায় ব্যস্ত।

কি হল? মালদেও রাতের অন্ধকারে এগিয়ে এল নাকি? কিংবা সুলতান মহম্মদ? কিন্তু তার জন্যে মায়ের এই দশা হবে কেন? তাতে তো মা উৎসাহিত উয়ে উঠবেন।

—কোথায় যাব মা? কি হয়েছে?

—ও তোকে ডাকছে?

—কে?

—ভবানী।

—ভবানী? আমাকে ডাকছে? এই রাতে?

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি চল্।

—কোথায়?

—ওর ঘরে।

—কি হয়েছে? স্পষ্ট করে বল মা।

—একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

—কার? কোথায়? কখন?

—ভবানীর। ও প্রাসাদের ওপরে উঠে চিতোরগড় দেখতে গিয়েছিল। সেই সময় পা পিছলে ওপর থেকে পড়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

কথাটা শুনেই, হাম্বীর মায়ের অপেক্ষা না করে পাগলের মত ছুটতে থাকে। ভবানী পড়ে গিয়েছে? অত উঁচু থেকে? তাহলে কি সে বাঁচবে?

কক্ষে প্রবেশ করে দেখে রক্তাক্ত বস্ত্র পরিহিত ভবানী শুয়ে রয়েছে। পাশে রাজবৈদ্য এবং আরও দুজন। ভবানীর বক্ষ খুব ধীরে ধীরে ওঠা নামা করছে। চোখ নিমীলিত।

হাম্বীর যেন কেমন হয়ে যায়। সে ছুটে ভবানীর পাশে গিয়ে বসে পড়ে ডাকে,—ভবানী—ভবানী? আমি বীর হাম্বীর।

একটুখানি চোখ মেলে ভবানী। একটু যেন হাসবারও চেষ্টা করে।

—ভবানী। রাতের বেলা ওপরে উঠতে গেলে কেন?

দম নিয়ে খুব আস্তে আস্তে ভবানী বলে,—তুমি যে বিশ্বাস করলে না সেদিন। তাই দেখতে গিয়েছিলাম। দেখা হল না। বিশ্বাস কর। আমি দেখতে পাই।

ভবানীর শ্বাস প্রশ্বাসে কেমন যেন আওয়াজ হয়। রাজবৈদ্য ইশারায় বলে,—শেষ হয়ে আসছে।

হাম্বীর কেঁদে ফেলে। বলে,—ভবানী। সামান্য কথার জন্যে এভাবে তুমি চলে গেলে? আমাকে চিতোর উদ্ধারের কথা কে বলবে? আমি কি তবে চিতোর কোনদিনই উদ্ধার করব না?

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে ভবানীর। গলার ভিতর ঘর ঘর আওয়াজ। সে বলে,—উদ্ধার করতেই হবে। তুমি যে বীর হাম্বীর।

আর বলা হয় না। তার শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ হয়ে যায়। তার শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়। চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

রাজবৈদ্য বলে,—ব্যাস্। শেষ হয়ে গেল।

হাম্বীরের মা কেঁদে ওঠেন। তিনি কি বলতে গিয়েও থেমে যান। তারপর শুধু বলেন,—তোর কষ্ট আমি বুঝতাম রে ভবানী! পরের জন্মে তোর মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়।

হাম্বীর বলে,—হ্যাঁ। তুমি স্বাধীন চিতোরগড়ে জন্মাবে। এ জন্মের কথা তোমার তখন মনে থাকবে না। কিন্তু কোন দুঃখ থাকবে না তোমার।

ভবানীর জন্যে পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হতে পারে না। মেবারের গতিও নয়। কৈলওয়ারায় দৈনন্দিন কাজকর্ম ঠিকই চলে। তবে হাম্বীর আর তার মায়ের মনের অবস্থা ঠিক আগের মত নয়। দুজনার মধ্যে অনেক সময়েই ভবানীর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। তাতে যেন কিছুটা শান্তি পাওয়া যায়। তবে শোক তুষের আগুনের মত একথা হাম্বীর জানে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না, অথচ ভেতরে ধিকিধিকি জ্বলে।

তবু হাম্বীরের বিবাহের একটি দিন নির্দিষ্ট হয় এবং সে যাত্রা করে চিতোর অভিমুখে। এ-যাত্রা শুভযাত্রা। কিন্তু দেখলে মনে হয় যুদ্ধ যাত্রা। যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে হাম্বীর রওনা হয়। ঠিক হয়, এই সৈন্যদলকে চিতোর থেকে কিছুটা দূরে লুকিয়ে রাখা হবে। যদি রাজপুরীর ভেতরে হাম্বীরের বিপদের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহলে এই সৈন্যদল ঝাঁপিয়ে পড়বে চিতোরগড়ের ওপর। হাম্বীরের কড়া নির্দেশ, তার মৃত্যু হলেও যেন এরা নিরাশ হয়ে ফিরে না যায়। মালদেও-এর বাহিনীকে ধ্বংস করাই হবে এদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই সঙ্গে মালদেও আর তার পুত্রদের হত্যা করতে হবে।

দূর থেকে চিতোরগড় দেখতে পায় হাম্বীর। জীবনে এই প্রথম দেখল। তার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাত তুলে প্রণাম জানায়। ঠিক যেন কোন মন্দিরে দেবী

প্রতিমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে তারা।

সৈন্যদলকে লুকিয়ে রেখে লাল সিং এবং অল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে হাম্বীর এগিয়ে যায়। ভুলে যায় বিবাহের পাত্র সে। ভুলে যায় শত্রুপুরীর দিকে চলেছে সে। সবকিছু মন থেকে মুছে গিয়ে সত্য হয়ে ওঠে চিতোরগড়। সাধের চিতোরগড।

লাল সিং বলে,—এত জোরে ছুটবেন না মহারাণা। একটু ধীরে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করুন। ওরা আপনাকে আপ্যায়ন করুক আগে।

—ওদের দেখতেই পাচ্ছি না। ওরা না থাকলে ক্ষতি কি? বেশ তো চলেছি একাই।

—আপনি মহারানা। শুধু সেই সম্মানেই ওদের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। তার ওপর আজ একটি বিশেষ দিন। এক দিনের আড়ম্বর কতখানি হওয়া উচিত আপনি নিশ্চয় জানেন। কই কিছুই তো দেখছি না। পথে তোরণ কোথায়? পথের দুধার সাজানো হয়নি কেন?

—তুমি বলতে চাও ওরা আমাকে অপমানিত করছে?

—সেই রকমই তো মনে হয়। তার চেয়েও গুরুতর আর একটা জিনিষ আমার মনে হতে পারত কিন্তু হচ্ছে না।

—কি জিনিষ।

—ওরা আপনাকে প্রতারণা করে রাজপুরীতে নিয়ে যেতে চাইলেও আড়ম্বর দেখাতে পারত। সেটা স্বাভাবিক ছিল।

—ঠিক বলেছ।

—তাই মনে হচ্ছে, ওরা আপনার ক্ষতি না-ও করতে পারে। আপনি যে অতি সাধারণ একজন ব্যক্তি সেটাই দেখাতে চায়।

—হুঁ। তোমার বুদ্ধি বেশ ভালরকম খেলে তো লাল সিং।

—লজ্জা দেবেন না মহারাণা।

—না না। লজ্জার কিছু নেই। কথাগুলো আমার মাথাতেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক আমার আচ্ছন্ন আজ। বিশেষ করে এই মুহূর্তে। দেখছ লাল সিং চিতোরগড় আমাকে যেন আকুল হয়ে ডাকছে।

—ডাকছে, সেকথা আমিও বিশ্বাস করি রাণা।

সেই সময় চিতোরগড়ের ফটকের সামনে একদল মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। হাম্বীর অনুচরদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেই একজন কৃতাঞ্জলি-পুটে এগিয়ে এসে বলে,—আমি রাও মালদেও চোহানের পুত্র বনবীর। আমার বাকী চার ভাই-ও এখানে উপস্থিত। আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে

পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে আসুন।

লাল সিং তোরণের কথা জিজ্ঞাসা করবে ভেবেও চুপ করে যায়। শোভনীয় হবে না। রাজারাজরার ব্যাপারে তার মত নগণ্য ব্যক্তির কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে জ্বলতে থাকে।

হাম্বীরের কোন দিকে খেয়াল নেই। কিসের একটা ঘোরে যেন সে চলছে। তার চোখে বিস্ময়। মায়ের মুখে শোনা নানান্ কাহিনীর কথা ভেবে তার গায়ে ঘন ঘন কাঁটা দিতে থাকে। সব কিছুই তো এখানে ঘটেছে।

—রাণা। বনবীর ডাকে।

চমকে ওঠে হাম্বীর।

—বলুন।

—আপনার সঙ্গীরা তো আর যেতে পারবেন না। এবারে আমরা প্রাসাদে প্রবেশ করব। ওঁরা পাশে ওই অট্টালিকায় বিশ্রাম নিতে পারেন। সব রকমের ব্যবস্থা রয়েছে ওঁদের জন্যে।

হাম্বীর কয়েক মুহূর্ত চারিদিকটা ভালভাবে দেখে নেয়। তারপর বলে,—ঠিক আছে।

লাল সিং দেখে বনবীরের পাশে একটি যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখ চেনা চেনা। কোথায় দেখেছে? একটু ভাবতেই মনে পড়ে যায়। এই যুবক এক রাতে তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছিল। এ হল লক্ষ্মীর ভাই।

লাল সিং বনবীরকে বলে,—আমরা অপেক্ষা করছি আপনার কথামত। মহারাণার জন্যে আমরা চিন্তায় থাকব। বুঝতেই পারছেন।

বনবীর অবাক হয়ে বলে,—না, ঠিক বুঝছি না।

লাল সিং বলে,—সোজা কথায় বলতে গেলে, মহারাণা আপনার মিত্র নন। দুদিন আগেও যুদ্ধ হয়েছে।

বনবীর একটু গম্ভীর হয়ে বলে,—হ্যাঁ। কিন্তু যখনি উনি নারকেল গ্রহণ করলেন তখন থেকে তো আর শত্রু নন।

—জানি। রাজপুত রীতি তাই বলে। তবে আজকাল রীতি লঙ্ঘনের ঘটনা দুচারটে ঘটে। এর জন্যে কিছু মনে করবেন না। পরিষ্কার বলে ফেলে বরং ভালই হল।

বনবীর স্বীকার করে সেকথা। বলে,—নিশ্চয়।

লাল সিং তখন লক্ষ্মীর ভাইকে দেখিয়ে বলে,—আপনি এঁকে যদি আমাদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেন তো বাধিত হব।

—না না। এর জন্যে বাধিত হবার কি আছে? এ তো সাধারণ

ব্যাপার।

বনবীরের নির্দেশে লক্ষ্মীর ভাই তাদের সঙ্গে থেকে যায়।

লাল সিং লোকটিকে বলে,—আপনার নাম কি ভাই?

—যশোবন্ত সিং।

—বাঃ! সুন্দর নাম। আপনার চেহারা আমার এক আত্মীয়ের মত। তাই দেখে খুব ভাল লাগল।

লোকটি লাল সিংকে ভাল ভাবে দেখেও চিনতে পারে না। মজা পায় লাল সিং। বলে,—আমার চেহারা আপনার পরিচিত মনে হচ্ছে না তো আবার?

—না। জীবনে কখনো দেখিনি।

—জানি। কারণ আমার আত্মীয়ের নাম যশোবন্ত নয়। তাছাড়া তিনি এখন গ্রামেই আছেন।

—ও।

—তিনি খুব ভাল যোদ্ধা। আপনি?

—সুনাম আছে।

—বাঃ মিল আছে দেখছি। তবে তাঁর জীবনে একটি ঘটনা ঘটায় তিনি অস্ত্র ধারণ ছেড়ে দিয়েছেন।

—তাই নাকি? যদি আপত্তি না থাকে, বলবেন কি?

—আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু সেটি বড় কলঙ্কের। আপনি তাকে জীবনেও দেখবেন না। তাছাড়া গ্রামের নামও বলছি না। আপনি জানতে চাইলেও বলব না।

—না না। আমি জানতেও চাইব না।

—ঘটনাটা সামান্য। তাঁর এক পরিচিত লোক ছিল। এককালে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল দুজনার মধ্যে। পরে একটি জমির ব্যাপারে মনান্তর হয়। একদিন আমার সেই আত্মীয় দূরের এক গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে রাত হয়ে যায়। গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখে সেই ব্যক্তিও সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। একই ঘরে রাত কাটাতে হবে। সেই লোকটি এতে খুবই আনন্দিত। একই গ্রামের মানুষ দুজনা। গভীর রাতে সবাই যখন নিদ্রিত, আমার আত্মীয়টি সেই ঘুমন্ত মানুষকে খুন করার জন্যে তলোয়ার তুলল। আর সেই সময় বাইরে কে যেন জোরে হেসে উঠল। আত্মীয়টি তখনি ঘর থেকে পাগলের মত বার হয়ে ছুটতে শুরু করল। সে হত্যা করতে পারল না। কিছুদূর ছুটে চলার পরে তার বিবেক তাকে দংশাতে শুরু করল। সেই দংশন

আজও চলছে।

লক্ষ্মীর ভাই-এর মুখের রক্ত অন্তর্হিত। সে ধীরে ধীরে মেঝের ওপর বসে পড়ে।

লাল সিং তার কাছে গিয়ে বলে,—শরীর খারাপ নাকি আপনার?

—না। কেমন লাগছে যেন।

—ও কিছু নয়। আপনি আমার আত্মীয়ের এই হীনতা সহ্য করতে পারছেন না। খুব স্বাভাবিক। তিনি নিজেও পারেন নি।

রাও মালদেও চোহান প্রাসাদের সামনে অপেক্ষা করছিল। হাম্বীর তাকে আগে কখনো দেখেনি। বনবীর পরিচয় করিয়ে দিল। উন্নত মস্তকে এক পলক মালদেও-এর চেহারা দেখল মাত্র। কোন কথা বলল না। তার জীবনের পবিত্রতম মুহূর্তটি এসে গিয়েছে। সেটি হল তার চিতোরের প্রাসাদে প্রবেশ। এই সময় বহিরাগত কোন এক মালদেও-এর সঙ্গে কথা বলা কিংবা ভদ্রতা করে কুশল জানতে চাইবার মত ধৈর্য হাম্বীরের থাকে না। সে মনে মনে দেবীকে প্রণাম করে। আর দেবী বলতেই তার চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে স্বচক্ষে দেখা সেই মাতৃরূপ—যাঁর সঙ্গে সে যুদ্ধ করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। তাঁর প্রদত্ত অসিটিকে সে সবার অলক্ষ্যে স্পর্শ করে।

ভেতরে প্রবেশ করে সে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তার পূর্বপুরুষেরা একসঙ্গে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। অস্পষ্ট ধ্বনি তার কানে গেল—আশীর্বাদের মন্ত্র উচ্চারণের ধ্বনি।

মালদেও বলে,—এদিকে আসুন। আয়োজন এইদিকে করা হয়েছে।

মালদেও-এর কথা হাম্বীরের কানে যায় না। সে প্রশ্ন করে,—আমার পূর্ব-পুরুষদের রাজসভা কোন্‌টি?

ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে মালদেও-এর। সে বলে,—আজকে ওসব দেখানো সম্ভব হবে না। আলাউদ্দিন সবকিছুই ধ্বংস করেছিলেন।

—একেবারে ধ্বংস হয়েছিল?

—পাথর একেবারে ধ্বংস হয় না। তবে এখন যা দেখলেন, সব আমার তৈরী। একে একে অনেককিছু মেরামত করেছি।

এবারে হাম্বীরের মুখে ভ্রূকুটি দেখা যায়।

—রাণী পদ্মিনীর ঘর এখান থেকে কতদূর? শুনেছি সেটি নাকি ধ্বংস হয়নি।

—না। তবে ওসব কালকে দেখবেন।

—কেন, আজ এখনো দিনের আলো রয়েছে কিছুটা। রাতে বাতি জ্বলে না?

—জ্বলে বৈকি। দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া আজ একটি পুণ্য দিন। যে কাজে এসেছেন তার শুভ সমাপ্তি আগে প্রয়োজন। আমি কন্যার পিতা। এ ব্যাপারে সব পিতাই সমান।

এতক্ষণে হাম্বীর সতর্ক হয়। চারদিকে তার শত্রু। মালদেও কন্যা সম্প্রদানের পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে পারে।

সে মালদেওকে অনুসরণ করে। মালদেও একটির পর একটি প্রকোষ্ঠ পার হতে থাকে। হাম্বীর মনে মনে চিহ্ন রেখে যায়। সহসা সে প্রশ্ন করে,—বিবাহ জিনিষটা কি একটা উৎসব?

পেছন থেকে বনবীর বলে,—নিশ্চয়।

—রাজার বিবাহ আরও বড় উৎসব তাহলে?

এবারে মালদেও বলে,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হাম্বীর গম্ভীর হয়ে বলে,—দেখে তো তেমন মনে হচ্ছে না। কোথাও কিছু-মাত্র আড়ম্বরের চিহ্ন নেই। কারণটা কি?

অপর পক্ষের সবাই নীরব।

হাম্বীর বলে,—আপনি রাও মালদেও, বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আপনার কি উচিত ছিল না, সবকিছুর ব্যবস্থা করা?

এবারও সবাই নীরব। শুধু মালদেও-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিসিং রেগে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বনবীরের বাধাদানে সে থেমে গিয়ে জ্বলতে থাকে। একজন অল্প বয়সী ছেলে তার প্রবীণ পিতাকে এভাবে অপমান করবে? ভেবেছে কি সে? মেবারের মহারাণা? অমন মহারাণাকে রাও মালদেও পুষতে পারে।

হাম্বীর বলে,—কথার জবাব না দেওয়া কি এখানকার রীতি?

হরিসিং আর চুপ থাকতে পারে না। বলে ওঠে,—লোক বিশেষে আমরা উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করি না।

হাম্বীর ঘুরে দাঁড়ায়। বলে,—ও! তাই নাকি? ঠিকই বুঝেছিলাম তাহলে। আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে এনে অপমান। প্রমাণ করা, যে সূর্যবংশের যারা কৈলওয়ারায় রয়েছে, তারা চিতোরগড়ের নতুন রাজার আশ্রিত। এই তো?

সবার বাধাদানের মধ্যে হরিসিং চেঁচিয়ে ওঠে,—হ্যাঁ, তাই। কি করবে শুনি?

কোথায় আছো জানো ?

—খুব ভালভাবে জানি। বংশপরম্পরায় জানি। কিন্তু আমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না। চিতোরগড়ের প্রতিটি পাষাণ তাহলে জেগে উঠবে। আপনারা এখানকার কিছুই জানেন না।

হরিসিং কিছু বলার আগেই মালদেও হাতজোড় করে বলে,—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ওর মেজাজ খুব খারাপ। এসব নিয়ে আজ কথা বলা উচিত হবে না। আগে বিবাহ পর্ব মিটে যাক। লগ্ন পার হলে আমার মেয়ের ক্ষতি।

—তার আগে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে।

—বলুন।

আপনার কি বিশ্বাস যে বিবাহ মিটলে আমি চিতোরগড় অধিকারের চেষ্টা ছেড়ে দেব? যদি ভেবে থাকেন, তবে বলে রাখছি সম্পূর্ণ ভুল ভেবেছেন।

হরিসিং চেঁচিয়ে ওঠার আগেই মালদেও প্রচণ্ডভাবে ধমকে ওঠে। তারপর শান্তস্বরে বলে,—আমি তো বলেছি, কোন কথা আজ নয়। শুধু বিবাহ পর্ব শেষ হোক আগে।

একটু ভেবে নিয়ে হাম্বীর বলে,—বেশ, তাই হোক।

হাম্বীর ভেবেছিল, মালদেও তাকে বিশ্রামের জন্যে কোথাও নিয়ে যাবে। কিন্তু সম্মুখে যা দেখল তাতে সে খুবই অবাক হল। দেখল, একটি প্রশস্ত চত্বরে বিবাহের সবকিছু আয়োজন প্রস্তুত। পুরোহিত বসে রয়েছে। এমনকি কন্যাও উপস্থিত।

এ কোন্ ধরনের বিবাহ? আশেপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সে। কোথাও লোকজন নেই। পুরনারীদের দেখা নেই। শুধু মালদেও আর তার পুত্রগণ।

হাম্বীর ভাবে, সে শত্রু হতে পারে। কিন্তু এই যে মেয়েটি বসে রয়েছে, যাকে সুন্দরী বলতে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না, এ তো মালদেও-এর নিজের কন্যা। এর পরিতৃপ্তির জন্যেও কি কিছুটা সমারোহের প্রয়োজন বোধ করেনি লোকটা? যে বস্ত্রে একে সজ্জিত করা হয়েছে সেটিও তেমন রঙীন নয়। তবে কি মেয়েটি তার নিজের কন্যা নয়? অন্য কাউকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে?

হাম্বীরের মনের ভিতরে প্রবল আলোড়ন। অথচ মুখ ফুটে সে কিছুই বলতে পারে না। ওরা তাকে বন্দী করার ফন্দী এঁটেছে। তলোয়ার স্পর্শ করে সে। দেবী তাকে নিজে এসে আশ্বাস দিয়েছেন। মৃত্যু-ভয় তার নেই। কিন্তু চিতোর

উদ্ধারের মুহূর্তটি বহু বছরের জন্যে পেছিয়ে যেতে পারে।

পুরোহিত হাম্বীরকে বসতে অনুরোধ করে।

হাম্বীর বলে,—এ কোন ধরনের পরিণয়?

মালদেও ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে,—কেন? কেন?

—জানিনা। তবে এভাবে অতি সাধারণ লোকের বাড়িতেও বিয়ে হতে দেখিনি।

—আয়োজন আমি ইচ্ছে করেই করিনি। আপনি তো জানেন, দেশে ফসল হচ্ছে না। চাষীরা আপনার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে! সুলতানের পাওনাটুকুও মিটিয়ে দিতে পারছি না।

—বেশ তো। আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এই বিয়েতে অন্য কাউকে উপস্থিত দেখছি না কেন?

—তারা বিষণ্ণ। আসতে তাদের দ্বিধা। তারা জানে কার জন্যে এই দুর্গতি।

—আপনার কন্যাও নিশ্চয় সেকথা জানেন?

মালদেও আমতা আমতা করে বলে,—হ্যাঁ, তা শুনেছে বৈকি।

—তাহলে তাঁকেই বা কেন জোর করে ধরে রেখেছেন এখানে? ছেড়ে দিন। আমার প্রতি সবার যখন এতই বৈরী ভাব তখন এ বিয়ে হওয়া উচিত নয়।

মালদেও কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিচলিত হয়। তারপর বলে,—না না, সে কি কথা? আমার মেয়েকে জোর করে ধরে রাখিনি। সে নিজের ইচ্ছাতেই রয়েছে। এই বিবাহে সে রাজী। আপনি কি মনে করেন, নিজের মেয়ের ওপর আমার স্নেহ নেই? আপনি কি মনে করেন, নিজের মেয়ের মঙ্গল আমি চাই না?

—সে কথাই তো ভাবছিলাম। আর সেই জন্যেই এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু মনের মধ্যে আর একটি প্রশ্ন জাগছে।

—কোন্ প্রশ্ন? বলুন, আপনি। কোন দ্বিধা রাখবেন না। আপনার সেই অধিকার রয়েছে। সব পরিষ্কার করে নিন।

—মেয়েটি কি যথার্থই আপনার?

পুরোহিত হাঁ হাঁ করে ওঠে। রাও মালদেও এগিয়ে গিয়ে অগ্নির ওপর হাত রেখে বলে,—এই অগ্নি স্পর্শ করে বলছি কন্যা আমার।

এতক্ষণ হাম্বীরের মনের মধ্যে আর একজনের মুখ ভেসে উঠছিল বারবার। সেই মুখ ভবানীর। সে বলেছিল, মালদেও-এর বিবাহযোগ্যা কন্যা নেই।

ভবানীর কথাই সত্য বলে ভেবে বসেছিল। কিন্তু মালদেও-এর প্রতিজ্ঞা শুনে ভবানীর শেষ সময়ের উক্তির মূল্যও দিতে পারল না সে। ভবানী বলেছিল,—বিশ্বাস করো। আমি দেখতে পাই। সে চিতোরগড়ের অন্তঃপুরের সব কিছু দেখতে পেত বলে দাবী করত।

মালদেও প্রতিজ্ঞার পর বলে,—আমিই আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করব।

পুরোহিতের আহ্বানে হাম্বীর উপবেশন করে। তার হাতের ওপর কন্যার হাত সমর্পণ করা হয়। এরপর মন্ত্রোচ্চারণ এবং নানান্ আচার উপাচার শুরু হয়।

হাম্বীর সদা সতর্ক। সে জানে তার পেছনে মালদেও-এর পুত্রেরা দণ্ডায়মান। তবে তাদের হাতে অসি নেই। অসি রয়েছে শুধু তারই কাছে। তবে ওরা কোন গুপ্ত অস্ত্র সঙ্গে রেখেছে কিনা জানা নেই। বিচিত্র নয় কিছুই। বিশেষ করে ওই হরিসিং-এর পক্ষে। লোকটি তাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। বড় ছেলে তো? পিতার মৃত্যুর পরে যে চিতোরগড়টি তার হবে! বড়ই দুরাশা!

এক সময়ে মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হয়। বিবাহপর্ব প্রায় শেষ হয়। একটু পরে পুরোহিত সেকথা ঘোষণা করে।

এই পর্বটিকে হাম্বীর প্রহসন বলেই ভাবত। কিন্তু প্রজ্বলিত অগ্নিকে সামনে সাক্ষী হিসাবে রাখা হয়েছে। তাছাড়া নব-পরিণীতা রূপসী এবং মালদেও নিজে তাকে কন্যা বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

এবারে হাম্বীরের অন্য চিন্তা। একটি রাতের মধ্যে চিতোরগড় খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হবে না। চোরের মত সবার অজ্ঞাতে সে দেখতে পারে। কিন্তু একজন সাহায্যকারী চাই। নব পরিণীতা কখনই রাজী হবে না। বরং তার সন্দেহ বাড়বে। বিপরীত ফল ফলবে তাতে। অথচ কাল সকালের মধ্যে না হোক মধ্যাহ্নের আগে তাকে বার হতে হবে।

হাম্বীর এবং কন্যাকে একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও কেউ নেই। সম্পূর্ণ নির্জন কক্ষটি।

মালদেও বলে,—সারাদিন খুব পরিশ্রম গিয়েছে। এবারে বিশ্রাম করুন। সব ব্যবস্থা করা আছে। আপনার খাদ্যও রয়েছে। বাইরে একজন পরিচারিকা সারারাত থাকবেন। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তাকে বলবেন।

মালদেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। সে হয়ত আশা করেছিল, হাম্বীর কিছু বলবে। তাকে নীরব দেখে ধীরে ধীরে চলে যায়।

হাম্বীর পরিচারিকাকে ডাকে।

সে এসে অভিবাদন করে।

—তোমার দেশ কোথায়?

—এই চিতোরে মহারাণা।

হাম্বীরের খটকা লাগে। তাকে 'মহারাণা' বলছে রমণী। ডাকের মধ্যে বেশ আনুগত্যের সুরও ফুটে উঠল যেন।

—বেশ। আমার খাবার আনো।

পরিচারিকা সঙ্গে সঙ্গে খুব যত্নের সঙ্গে আসন পাতে। তারপর ঘরের এক কোণ থেকে এনে খাবার সাজিয়ে দেয়।

হাম্বীর লক্ষ্য করে খাবার আয়োজনটি মন্দ নয়। সে ভাবে, এর মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে কি মালদেও?

একবার নব-পরিণীতার দিকে চায়। সলজ্জ ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। ওড়নায় মুখ ঢাকা। রাতের আলো অস্পষ্ট থাকায় মুখ দেখা যায় না। তবে সে সবকিছু লক্ষ্য করছে বোঝা যায়।

পরিচারিকাকে সে প্রশ্ন করে,—এই খাবারের প্রতিটি জিনিস থেকে সামান্য তুলে নিয়ে আর একটি থালায় সাজাও।

পরিচারিকা প্রথমে বুঝতে পারে না। হাম্বীর বুঝিয়ে দেয়। অতিমাত্রায় ক্ষুধার্ত না হলেও এত কাণ্ড সে করত না।

পরিচারিকা তার কথা মত সবকিছু থেকে একটু একটু করে তুলে নিয়ে থালা সাজিয়ে ফেলে।

হাম্বীর বলে,—এবারে এই জিনিস আমার সামনে একজনকে খেতে হবে।

এতক্ষণে পরিচারিকা বুঝতে পারে। তার চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। সেই আতঙ্ক হাম্বীর লক্ষ্য করে হেসে ফেলে। বলে,—ভয় পাচ্ছো?

অত্যন্ত বিনীত ভাবে রমণী বলে,—আমার জীবনের ভয় নয় মহারাণা। ভাবছি আপনার কথা। আপনি অনুমতি দিলে আমি খেতে পারি। এ আমার মহান কর্তব্য।

—তুমি যে ভাবে কথা বলছ, তাতে তোমার ক্ষতি হবে না? তুমি কি জানো না আমি এদের শত্রু?

—জানি। তবু—

—আর কেউ? আর কেউ আস্বাদন করতে পারবে?

বধূ পরিচারিকাকে ইঙ্গিতে ডাকে। সে কাছে গেলে ফিস ফিস করে কি যেন বলে। তাই শুনে সে হাম্বীরের সামনে এসে বলে,—উনি বললেন ওই খাবার যে কেউ খেতে পারে। কারণ ওতে বিষ নেই। রাও মালদেও নিজের সর্বনাশ

করবেন না এভাবে।

—তাই বুঝি? বেশ উনি যখন বলছেন আমি খাচ্ছি। কারণ আমার মৃত্যু হলে—

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নব-পরিণীতা।

হৃষ্টচিত্তে হাম্বীর খাবার খেয়ে নেয়।

পরিচারিকা সবকিছু পরিষ্কার করে দিয়ে বাইরে চলে যায় আবার। হাম্বীর আঙুলে গোনে,—এক,—দুই। প্রথম দুজনই তার প্রতি বিশ্বস্ত। কিন্তু এরা নারী। প্রাসাদ রক্ষীদের মধ্যে মহারাণার অনুগত কেউ আছে কি?

রাত আরও গভীর হয়। চারদিক নিঝুম। এই বিবাহের ব্যাপারে প্রাসাদের নারী-পুরুষ কারও কিছুমাত্র ঔৎসুক্য নেই। থাকলে আজ হাজার বাতিতে প্রাসাদ সারারাত আলোকিত হয়ে থাকত। এই বাসর-ঘরে নারীদের আনাগোনার বিরাম থাকত না। হাম্বীর ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। যাক্, ভালই হয়েছে। দেবীর অভিপ্রেত হয়ত এই রকম। সে একবার বাইরে গিয়ে প্রাসাদটা ঘুরে আসতে চায়। কিন্তু এই সলজ্জ ভঙ্গীতে বসে থাকা তরুণীর সাহায্য ছাড়া গতি নেই। ওর সঙ্গে এ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি সে।

চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে হাম্বীর কক্ষের মধ্যে পায়চারী শুরু করে দেয়। সে এটুকু বুঝেছে তাকে হত্যা করবে না ওরা; তবে বন্দী করে রাখার কথা বলা যায় না।

স্ত্রীর সামনে এগিয়ে গিয়ে হাম্বীর বলে,—আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেবে?

ঘাড় হেলিয়ে বধূ সম্মতি জানায়।

—তুমি তো রাও-এর কন্যা।

—হ্যাঁ।

এই প্রথম বধূর কণ্ঠস্বর শুনল। বেশ ভালই। কর্কশ নয়।

—আমার সঙ্গে বিবাহে তুমি সুখী? মনে রেখো, আমি তোমার পিতার মিত্র নই। আর যতদিন এখানে রাজধানী স্থাপন করতে না পারি, ততদিন মিত্র হব না।

বধূ একটু সময় চুপ করে থেকে বলে,—রাজপুতানার রমণী হয়ে এর চেয়ে সুখ কেউ আশা করে না মহারাণা।

হাম্বীর লক্ষ্য করে, কথা কয়টি অনেক কষ্টে উচ্চারণ করে বধূ। তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে ওঠে। সে বুঝতে পারে না, কেন এমন হল। হয়ত সব মেয়েদেরই অমন হয়।

—আমাকে তুমি পদ্মিনীদেবীর কক্ষটি দেখাতে পার?

—এই রাতে ?

—হ্যাঁ। কবে আর সময় পাব জানি না।

বিনা দ্বিধায় নব-পরিণীতা তখনি উঠে দাঁড়ায়। বলে,—আসুন।

হাম্বীর অনুসরণ করে তাকে। সে লক্ষ্য করে তার স্ত্রীর চলার ভঙ্গিও সুন্দর।

ওরা কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর বধূ বলে,—আপনি রাজসভা দেখতে চেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—সেই দিকে আগে যাই।

—সে তো বাইরের দিকে। কেউ দেখবে না ?

—বোধহয় না। প্রহরীর ব্যবস্থা প্রাসাদের বাইরে রয়েছে।

হাম্বীরও তাই লক্ষ্য করে। একজন মানুষকেও দেখা যায় না। ওরা বলতে গেলে অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হয়।

হাম্বীর বলে,—প্রাসাদ এই রকম অরক্ষিত পড়ে থাকে ?

—হ্যাঁ। আমার বাবা ভেতরে বেশী প্রহরী রাখা পছন্দ করেন না।

ওরা এগিয়ে চলে। কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না আশেপাশে। হঠাৎ একটি ফাঁকা জায়গায় এসে থেমে যায় বধূ।

—থামলে যে ?

—এটি শেষ জহরব্রতের জায়গা।

হাম্বীর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আলাউদ্দিন চিতোরে প্রবেশ করলে কুলললনাগণ এইখানেই আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। সে মাটিতে নতজানু হয়ে বসে প্রণাম জানায়।

বধূ বলে,—ওপরে দুর্বার আস্তরণ এখানে। দুর্বা তুলে ফেললে দেখবেন পোড়া কাঠের কালো গুঁড়ো। সব জায়গায় সবুজও হয়নি ভাল করে। এখন দেখতে পাচ্ছেন না আলো নেই বলে।

—এসব কথা তুমি ভাব ?

—হ্যাঁ। চিতোরের নারীরা এখানে এসে বিশেষ বিশেষ দিনে প্রদীপ দিয়ে যায়।

—আপত্তি করে না কেউ ?

—তাই কি পারে ?

রাজসভায় প্রবেশ করে ওরা। কিছু ঠাহর করা যায় না। তবু হাম্বীর অনুভব করে, তার দেহে কিসের এক তরঙ্গ। এটি ধ্বংস হয়েছিল বলতে গেলে। তবু অস্তিত্ব রয়েছে।

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ দাঁড়ায় খেয়াল থাকে না। বধূর ডাকে তন্ময়তা ভাঙে।

—আসুন। পদ্মিনীদেবীর কক্ষ দেখবেন।

—হ্যাঁ, চল। একটা কথা বলে রাখি, মালদেও-এর কন্যা বলে তোমার প্রতি আমার এতটুকুও বিরক্তি নেই। আমি সন্তুষ্ট।

বধূ আগের মত আবার কেঁপে ওঠে।

ওরা পদ্মিনীদেবীর কক্ষে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পরে। সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। ওখানকার সব কিছুই রয়েছে। এমন কি পদ্মিনীদেবীর ব্যবহার্য পোষাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত। আলাউদ্দিনের কড়া নির্দেশেই এটি সম্ভব হয়েছে। হাম্বীর বুঝতে পারে না, কেন এই দয়া হয়েছিল দিল্লীর সুলতানের। সে সবকিছু নেড়ে চেড়ে দেখে। কত আদরের জিনিস, কত শ্রদ্ধার জিনিস এ-সব।

অনেকক্ষণ পরে বধূ বলে,—এবারে চলুন।

—হ্যাঁ চল।

ওরা আগের কক্ষে ফিরে আসে।

হাম্বীর শয্যায় বধূর পাশে বসে বলে,—তোমার রূপ আছে। গুণও আছে। শত্রুর কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে আমার ভুল হয়নি। আমার বিশ্বাস জন্মেছে মহারাণার স্ত্রীর মর্যাদা তুমি রাখতে পারবে।

রাও-এর কন্যা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্নার আকুলতা হাম্বীরকে খুবই বিস্মিত করে। তার মনে অনুকম্পা জাগে। সে স্ত্রীর হাত দুখানা নিজের হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলে,—তুমি কাঁদছ কেন? আমি তো রূঢ় হইনি তোমার প্রতি? যে চাঞ্চল্য আমার মধ্যে লক্ষ্য করছ সেটা অন্য কারণে।

—সেজন্য নয়। আমি আমরণ তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। আমি রাজপুত নারী। তোমাকে ভালবাসতে পারা কোন পরীক্ষাই নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী, একবার মাত্র দেখেই তোমায় ভালবাসতে পারে।

—তবে? তবে কেন এভাবে কাঁদছ। এ তো সুখের কান্না নয়?

—আমি অপরাধী মহারাণা। এই অপরাধে আমার কোন হাত নেই। তাই কাঁদছি। আমি কাঁদছি আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে? তুমি বলতে চাও আমার কোন বিপদ ঘটতে চলেছে?

—না। তাহলে কাঁদতাম না। বিপদকে অতিক্রম করা তোমার পক্ষে খুব সহজ। তাছাড়া তোমার বিপদের কথা আমি জানলে, তোমার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আর তোমার বিপদের সম্ভাবনা থাকলে আমি জানতাম।

—তাহলে?

বধূ আবার কাঁদতে থাকে। শেষে অতি কষ্টে বলে,—আমি কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারছি না সেকথা।

—তবে থাক। কষ্ট করে কিছু বলতে হবে না। কৈলওয়ারায় গিয়ে বলো।

—না। একটু সময় দাও দয়া করে। আমাকে বলতেই হবে। কিন্তু তারপর তুমি মাথা গরম করে কিছু করতে যেওনা এখানে। আমাকে নিয়ে যাবার সময় পথের মাঝে কোনখানে আমাকে হত্যা করে তুমি ফিরে যেও।

—তোমাকে হত্যা করব! এসব কি বলছ!

—হ্যাঁ ঠিক বলছি। হত্যা ছাড়া এ কলঙ্ক ঘুচবে কি করে?

—কোন্ কলঙ্ক?

—আমি, আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু আমার আর একটি পরিচয় রয়েছে সেই পরিচয় আমি মানি না।

—কি পরিচয়?

—আমি বিধবা।

হাম্বীরের মুঠো আলগা হয়ে বধূর হাত দুখানা খসে পড়ে। তার চোখের সামনে থেকে সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। সে ভুলে যায় কোথায় আছে। সে তার নিজের পরিচয়ও ভুলে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। মস্তিষ্কের কাজ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটা অস্পষ্টতা, একটা অস্বচ্ছতা বিরাজ করে দৃষ্টির সামনে। আর সেই অস্পষ্টতার মধ্যে থেকে কী যেন ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। একখানি মুখ। সেই মুখ যেন চাঁদের কিরণ দিয়ে তৈরী। পরিচিত মুখ। সে মুখ ভবানীর।

ওষ্ঠদ্বয় নড়ছে ভবানীর। কি যেন বলছে। হাম্বীর কান পেতে শুনছে ভবানীর উক্তি। বলছে,—বিশ্বাস কর। আমি দেখতে পাই। সত্যিই দেখতে পাই।

হাম্বীর বিড়বিড় করে বলে,—আমায় ক্ষমা করো। তোমার শেষ কথাও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন পারছি।

বধূ ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, না না। ক্ষমা কেন মহারাণা। ক্ষমা তো আমি চাইব। যদিও এটি ক্ষমাহীন অপরাধ।

হাম্বীর চমকে ওঠে। ভবানীর মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। সে মুখ নীচু করে। চোখ বন্ধ করে সে। আর একবার ভবানীকে দেখার ইচ্ছা। ভবানী তার আর মেবারের সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষিনী। সে ওভাবে চলে গেল কেন? তার পতন কি দুর্ঘটনা? না কি ইচ্ছা মৃত্যু। কেন? কেন সে মরতে গেল ওভাবে? যার শক্তি ঈশ্বরের শক্তিকে স্পর্শ করে, সেকি বেশীদিন থাকে না পৃথিবীতে?

হাম্বীর শুনতে পায়, পরিণয়-সূত্রে যে তার স্ত্রী হয়েছে, সে বলছে—আমি বালা

বিধবা। শৈশবে আমার নাকি বিয়ে হয়েছিল কোন ভাত্তি সর্দারের সঙ্গে। মনে নেই। কিছুই মনে নেই। বিয়ের পরই সেই সর্দার মরে যায়। আমি জানতাম না কিছুই। শুধু দেখতাম, সবাই যা করে, আমি করতে পারি না। সবাই যা খায়, আমি খেতে পারি না। জানলাম এই কিছুদিন আগে। কোন পুরুষের কোন প্রভাব আমায় মধ্যে নেই। কুমারী মেয়ের মত আমিও স্বপ্ন দেখতাম। এই গড়ের মধ্যে থেকে স্বপ্ন দেখতাম শুধু তোমাকে।

হাম্বীরের বাকশক্তি ফিরে আসেনি। তবে সে শুনতে পায় সব। সে মুখ তুলে বধূর দিকে চায়।

বধূ বলে,—হতাশ হয়ো না। তুমি মহারাণা। তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে সমস্ত রাজস্থান। তাদের মনে বিরাট প্রত্যাশা। এত অল্পে হতাশ হতে নেই। আমি জানি, চিতোরগড় দখল করা তোমার স্বপ্ন—তোমার প্রতিজ্ঞা। আমি তোমার স্ত্রী। একদিন পরে মৃত্যু হলেও তোমার স্ত্রী। আগের বিবাহ আমি স্বীকার করি না। আমি তোমাকে এই গড় অধিকারে কিছুটা সাহায্য করে যাব। ছেলেবেলা থেকেই আমি কামনা করি চিতোরগড়ে মহারাণা ফিরে আসুন। দেবীর কাছে দুবেলা প্রার্থনা করেছি। প্রার্থনা করেছি, মহারাণার হাতে তিনি যেন বজ্রের মত কোন অস্ত্র প্রদান করেন। সেই অস্ত্রে তিনি হবেন দুর্জয়।

বধূ থামে। হাম্বীরের মনে নানান্ প্রশ্নের উত্থান-পতন। সেই সঙ্গে মনে পড়ে এই মেয়েটির প্রতি ভবানীর ছিল অপার সহানুভূতি। ভবানী একে ভালবাসত।

সে বলে,—কীভাবে সাহায্য করবে আমাকে?

—আমি কালই এখানকার সৈন্যদের মধ্যে তোমার পক্ষে প্রচার চালাবার ব্যবস্থা করে যাব। বাবার প্রতি এদের এমনকিছু আনুগত্য নেই। শুধু পেটের দায়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্রচারের ফলে এদের কৃত্রিম আনুগত্য আর থাকবে না। তাছাড়া আরও একটি কাজ করতে হবে।

—কি কাজ?

—আমাকে নিয়ে যাবার সময়, রওনা হবার আগে, বিবাহের যৌতুক হিসাবে একজনকে চেয়ে নিতে হবে।

—কাকে?

—তার নাম জাল। একজন কর্মচারী। কিন্তু সব চাইতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী সে। সে তোমাকে সাহায্য করবে সব সময়।

—বেশ। কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এতসব করতে চাইছ কেন?

বধূ অস্পষ্ট অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে,—তুমি যে আমার স্বামী। মৃত্যুর আগে প্রার্থনা করে যাব পরের জন্মে যেন তোমাকে আবার পাই। ঈশ্বর শুনবেন না

আমার প্রার্থনা ? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। শুনবেন না ? তুমিই বল।

—আমি ঠিক বলতে পারছি না।

বধূর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে বলে,—আমি জানি, তুমি আমাকে চাইবে না। কিন্তু আমি তো আর কাউকে জানি না। তোমার মন যাতে আমার প্রতি সদয় হয় তার জন্যে তপস্যা করব। দেখো তুমি আর ঠেলতে পারবে না। এখন তোমার মনে যে বিরূপতা রয়েছে তা কেটে যাবে। পরের জন্মে বিফল হলেও, তার পরের জন্মে তোমারই স্ত্রী হব। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর। আমার চেষ্টা যাতে ফলবতী হয়।

বধূ শয্যা ছেড়ে নীচে নেমে হাম্বীরের দুই পায়ের ওপর মাথা রাখে।

হাম্বীর তার বাহু দুটি ধরে ওঠায়। তারপর বলে,—কিন্তু মৃত্যু তোমার অত সহজে হবে কি করে ?

—খুব সহজ। আমায় তুমি প্রার্থনা করতে অনুমতি দিও। সেই সময় আমার মাথা কেটে ফেলো। আমি বুঝতে পারব না।

—সে কথা নয়। তুমি যে তপস্যা করার কথা বলছ সেই তপস্যা তো আগে থেকেই শুরু করেছ।

—গত জন্মের কথা বলছ ? হতে পারে। ঠিক বলেছ। নইলে কি করে আমাদের বিয়ে হল ? একদিনের জন্যে হলেও তোমার স্ত্রী আমি।

—আর এ-জন্মেও করেছ। ঠিক করে বলতো ?

—হ্যাঁ। দেবীর কাছে শুধু তোমারই কথা বলতাম। একে আমার স্পর্ধা বলে ভেবো না দয়া করে।

—না। স্পর্ধা ভাবব কেন ? কারণ দেবী যে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

—হ্যাঁ। নইলে এভাবে বিয়ে হত না। সত্যিই অদ্ভুত। দেবীর কৃপার শেষ নেই।

—সত্যিই তাই। দেবী জানেন যে হাম্বীরের স্ত্রীর পরিণত বয়সেই মৃত্যু হয়।

—দেবী—কি বললে ?

—বললাম, হাম্বীরের স্ত্রীর মৃত্যু অপরিণত বয়সে হয় না।

—না না। এ তুমি কি বলছ ? কেন এভাবে লোভ দেখাচ্ছ গো ? এ যে নিষ্ঠুরতা। তোমাকে দেখলে তো নিষ্ঠুর বলে মনে হয় না।

থরথর করে কাঁপতে থাকে বধূ। হাম্বীর তাকে দুহাতে বেষ্টন করে বলে,—নিষ্ঠুর হব কেন ? সব নিষ্ঠুরতাই তো শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে। নিজের স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর হয় কেউ ? তুমি যে আমার স্ত্রী। চিরকালের স্ত্রী। এ জন্মের—গত জন্মের—আগামী জন্মেরও।

ওদিকে লাল সিং লক্ষ্মীর দাদার সঙ্গে ভালরকম ভাব জমিয়ে বসেছে। তার বেশ মজা লাগে। একদিন যে তাকে হত্যা করবে বলে মনস্থ করেছিল, সে আজ কত সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলছে। শত হলেও অতিথি। বলতে গেলে বরযাত্রী।

একসময় লাল সিং তাকে জিজ্ঞাসা করে,—আপনার বাড়ি নিশ্চয় চিতোরগড়ে?

—হ্যাঁ।

—অথচ আপনার হাত দেখলে মনে হয় চাষের কাজে আপনি খুব পোক্ত।

—ঠিক ধরেছেন। আমার বাড়ি গ্রামে। চিতোরে থাকি চাকরীর খাতিরে।

লাল সিং-এর মন দমে যায়। সে ভেবেছিল, গ্রামের পাট চুকিয়ে বোধহয় চলেই এসেছে লোকটা। তাহলে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করার একটা ক্ষীণ সুযোগ মিলত। কয়েক বছর হয়ে গেল। এখন লক্ষ্মীকে দেখলে সে চিনতেই পারবে না প্রথমে। লক্ষ্মীও তাকে দেখলে হয়ত চিনবে না। হয়ত তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মীর ভেতরে যাকে সে চাঞ্চল্য বলে মনে করেছিল সেদিন তা হয়ত নারীর স্বাভাবিক মমত্ববোধ।

লাল সিং বলে,—এখানে পরিবার নিয়ে থাকেন নিশ্চয়।

—আমি বিয়ে করিনি।

—বাবা মা? তাঁরা গ্রামেই থাকেন?

—বাবা মা বেঁচে নেই। তাছাড়া গ্রাম তো জনশূন্য। কেউ তো থাকে না। আপনারা জানেন নিশ্চয়। মহারাণার আদেশেই তো সবাই গ্রাম ছেড়েছে।

—আপনি একা?

—না, একটি বোন রয়েছে। সে থাকে আমার কাছে।

লাল সিং-এর মন নেচে ওঠে। এ যে কল্পনাতীত! মহারাণার চিন্তাও তার মন থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুছে যায়। সে তার সঙ্গীদের কানে কানে বলে,—আমি একটু ঘুরে আসতে চাই।

ওরা সম্মতি জানায়।

লাল সিং লক্ষ্মীর দাদাকে বলে,—চলুন না আপনার বাড়ি দেখে আসি। সহরটাও দেখা হবে।

—গরীবের বাড়ি। কি দেখবেন।

—আমিও বড়লোক নই। এই প্রাসাদে হাঁপিয়ে উঠেছি।

—বেশ তো চলুন। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে।

লাল সিং জোরে হেসে ওঠে। সেই রাতের কথা মনে হয়।

—হাসলেন যে?

—না। আপনার কথা শুনে হাসি পেল। আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। আপনি আমার সঙ্গে রাজরাজরার মত ব্যবহার করছেন।

—আপনি রাজার অতিথি। সাধারণ ব্যবহার করা উচিত নয়।

ওরা কিছুদূর হেঁটে একটি গৃহের সামনে এসে থামে। লোকটি লাল সিংকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে প্রবেশ করে। ভগিনীকে আগে-ভাগে জানিয়ে দিতে চায়।

একটু পরে সে বাইরে এসে বলে',—আসুন।

লাল সিং লক্ষ্মীকে কতদিন পরে দেখে। চিতোরে এসে রূপ যেন আরও ফেটে পড়ছে। সে লক্ষ্য করে লক্ষ্মী সামান্য সময় তার দিকে চেয়েই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে পাশের ঘরে চলে গেল। বোধহয় জলপানের আয়োজন করবে। কিন্তু তার মুখে এতটুকুও বিস্ময় ফুটে উঠল না তো? সে কি চিনতে পারল না তাকে? কিংবা সামান্য পরিচিত ব্যক্তিটিকে একেবারে ভুলে গেল?

যুবক একটি আসন পেতে দিয়ে বলে,—আপনি বসুন।

লাল সিং বসে বটে। কিন্তু তার মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবে, আসাটা বোধহয় উচিত হয়নি। সে লক্ষ্মীকে সেদিন যতটা গুরুত্ব দিয়েছিল, লক্ষ্মী ততটা কখনই দেয়নি। দিলে, আজ চিনতে পারত। তার চেহারায় এমনকিছু পরিবর্তন হয়নি।

একটু পরে যুবক বলে,—আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমি এখুনি আসছি।

—কোথায় চললেন?

—আপনি এখন আমার অতিথি। সামর্থ্য বেশী নেই। তবু যথাযোগ্য আপ্যায়ন করতে চাই। খুব ভাল দই পাওয়া যায় এখানে। আমি নিয়ে আসছি। প্রাসাদ থেকে তো পরে খাবার আসবেই অতিথিশালায়।

লোকটি চলে যায়। এইবারে চমৎকার সুযোগ। একবার বাজিয়ে দেখতে হবে লক্ষ্মীকে। এবারেও যদি না চিনতে পারে, তবে আর বলার কিছু নেই। জোর করে সে পরিচয় দিতে যাবে না। সামান্য ছাপও যদি না ফেলতে পারে লক্ষ্মীর মনে, তবে কী দরকার নতুন করে পরিচিত হবার?

সে বলে,—একটু জল পাবো?

লক্ষ্মী একপাত্র জল এনে সামনে রাখে।

এবারও চিনল না তাকে। বেশ। সে বলে,—মিষ্টি কিছু আছে? শুধু জল খেতে ভাল লাগছে না।

লক্ষ্মী এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। লাল সিং-এর মুখের দিকে চায়। তার চোখ দেখে বোঝা যায়, চিনি চিনি করেও চিনতে পারছে না।

আর চেনার দরকার নেই। মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। বাহারি পাগড়ীটা নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় খুলে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট ধ্বনি শোনে লক্ষ্মীর কণ্ঠে। সে চেয়ে দেখে লক্ষ্মী বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে কোনমতে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে।

—যাক চিনেছো তাহলে।

—তুমি—তুমি এখানে? কি করে এলে? দাদা চিনতে পারেনি?

—চিনতে এত দেরি হল তোমার?

—অতবড় পাগড়ী। মুখের দিকে ভালভাবে তাকাইনি। গলার স্বর শুনে কেমন যেন লাগল।

এতক্ষণে মাথায় ঢোকে লাল সিং-এর। তার পাগড়ী সাংঘাতিক শত্রুতা করে চলেছিল তার সঙ্গে। লক্ষ্মী তাকে খালি মাথায় দেখেছে। রাজকীয় পাগড়ীর নীচে যে লাল সিং লুকিয়ে রয়েছে, সেকথা ভাবতে পারেনি।

—আর জল চাই না লক্ষ্মী। তোমাকে কাছে আনতে চেয়েছিলাম। এবারে একটু কাছে এসো।

—দাদা চিনতে পারেনি?

—তাই কি পারে? সবার চোখ কি তোমার মত?

—তুমি তাহলে আমাকে দেখতে এসেছ?

—তবে কি জন্য আসব? দই খেতে?

লক্ষ্মী তার হাত চেপে ধরে বলে,—তুমি একটা আস্ত পাগল।

লাল সিং তার গাল টিপে দিয়ে বলে,—আর তুমি?

—জানি না যাও। কী ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে।

—আর আনন্দ?

লক্ষ্মী শুধু হাসে।

—আবার কবে দেখা হবে লক্ষ্মী?

—তুমি যেদিন দেখা দেবে।

—এবারে যখন দেখা দেব, ফেলে যাব না তোমাকে। রাজী?

লক্ষ্মী লজ্জায় লাল হয়ে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

—আর তোমার দাদা যদি অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করেন ?

—বাধা দেব। তাই হয় নাকি ? তুমি অদ্ভুত কথা বলছ।

—তোমার দাদা তো জানেন না এসব।

—না জানুক। তাই আবার হয় ? তুমি কী যা তা বল ?

—ধর, যদি জোর করে ?

—তাহলে তো আত্মহত্যা করব। সবাই জানে। এ আবার কঠিন নাকি ?

লাল সিং-এর হৃদয় আবেগে আপ্লুত হয়। ভাবে, কতবড় সৌভাগ্যবান সে।

সেই সময় বাইরে পদ শব্দ পেয়ে লক্ষ্মী চট্ করে সরে যায়। দই-এর পাত্র হাতে নিয়ে যুবক প্রবেশ করে।

কৈলওয়ারায় বিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশের মুখে হাম্বীর দেখে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। চিতোরে এতটুকুও জাঁকজমক ছিল না। এখানে জাকজমকের অন্ত নেই। রাস্তার ওপর কিছুদূর পর পর সুদৃশ্য তোরণ। আশেপাশের গৃহগুলিও সজ্জিত। পথের দুধারে নগরবাসীর ভীড়। বাতায়নগুলোতে গৃহস্থবধূরা এসে দাঁড়িয়েছে। ওপর থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছে তারা। হাম্বীর ভাবে, এত সব কে করল ? কাউকে তো সে নির্দেশ দেয় নি। তার মা কি এসবের ব্যবস্থা করেছেন ? নাকি এ আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত। সে মহারানা বলেই শুধু এত সব হতে পারে না। মালদেও-এর কন্যাকে বিবাহের জন্যে এদের মনোভাব তাহলে বিরূপ নয়।

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে ওড়নার আড়ালে তার চোখ দুটো বিস্ময়াবিষ্ট। মুখ পরিতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। দেখে আনন্দ হয় তার।

নগরবাসীরা জয়ধ্বনি করে। নানান্ ভাবে অভিবাদন জানায়। তারা রাণীকে দেখে সন্তুষ্ট। কারণ রাণী রূপসী।

স্ত্রী নিম্নস্বরে বলে,—যাঁরা নিজের অধিকারে রাণা হন তাঁরা এই রকমই অভিবাদন পেয়ে থাকেন। আমার বাবা কিংবা দাদারা এ ধরনের অভ্যর্থনা কল্পনাও করতে পারবে না। ওদের কেউ ভালবাসে না, ওদের সবাই ভয় করে।

হাম্বীর কোন মন্তব্য করে না।

প্রাসাদে প্রবেশ করে তারা। তারপর প্রথমেই মায়ের আশীর্বাদের জন্যে এগিয়ে যায় হাম্বীর বধূকে সঙ্গে নিয়ে।

বধূর মুখ দেখে মায়ের হাসি ফোটে। হাম্বীর বধূর মুখে আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করে। এ আতঙ্ক প্রত্যাশিত। কারণ তার মা এখনো জানেন না পুত্রবধূ বিবাহের

আগে ছিল বিধবা। জানলে, প্রতিক্রিয়া কেমন হবে ঠিক নেই।

কিন্তু জানতে বেশী সময় লাগল না। আচার নিষ্ঠা পালন করার পরে মা হাম্বীরকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠালেন।

হাম্বীর এসে বসলে মা আনুপূর্বিক সব কিছু শুনতে চাইলেন। সে একে একে বলে যায়। প্রথম থেকেই বলে কিভাবে তারা অভ্যর্থনা করল। বিবাহে আড়ম্বরের ছিটে ফোঁটাও ছিল না ইত্যাদি।

শুনে মা প্রথমে গম্ভীর হয়ে যান। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে উচ্চারণ করেন,—তোমার সেই মুহূর্তেই চলে আসা উচিত ছিল।

—পারলাম না। ভেবে দেখ, চিতোরগড়ের ভেতরে বসে রয়েছি, অথচ কিছুই তখনো দেখিনি। অনুভব করেছি, ওই সব কক্ষে আমার পূর্বপুরুষেরা বসবাস করে গিয়েছেন কতকাল ধরে। ওই গড় ছিল সারা দেশের হৃদপিণ্ড। আমি পারলাম না তাই।

আরও অনেকবার অনেক কিছু বলার পর মা শান্ত হন। শেষে এক সময় বলেন,—যা হোক, একটি কথা ভেবে আমরি দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

—কি কথা মা?

—না। সেই সব আর এখন বলা ঠিক হবে না।

—আমার জীবন সম্বন্ধে?

—না না হাম্বীর। তোমার জীবন সম্বন্ধে আমার কখনো দুশ্চিন্তা হয় না। জীবন দান করেন ঈশ্বর। সেই জীবনকে দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে সেটা ঈশ্বরের দায়িত্ব। আমার দায়িত্ব, তোমাকে ঠিক ভাবে গড়ে তোলা। সেই দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করেছি।

—তবে? দুশ্চিন্তার আর কি থাকতে পারে?

—একজনের একটি উক্তি। তার সেই উক্তিকে আমি নিছক স্বপ্নবিলাস বলে কখনো উড়িয়ে দিতে পারিনি। এখন বুঝলাম আমি ভুল করে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে হাম্বীর বুঝে ফেলে। এবারে তাকে সত্যিকথা বলে ফেলতেই হবে। এখন গোপন করে রেখে পরে প্রকাশ করে দেওয়া হবে ঘোর অন্যায়। নিজেকে একটু অসহায় বলে মনে হয়। অথচ নিজে এড়িয়ে গিয়ে স্ত্রীকে মায়ের সামনে ঠেলে দেওয়া হবে চরম কাপুরুষতা।

মনে মনে দেবীকে স্মরণ করে সে বলে,—না মা, ভবানী একবিন্দু মিথ্যে বলেনি কখনো।

মায়ের কণ্ঠে অদ্ভুত স্বর,—কি বললে?

—ভবানী সবকিছু দেখতে পেত। সে যা যা দেখত সব সত্য।

—তার মানে? বলতে চাও, তুমি রাও মালদেও চোহানের কন্যাকে বিয়ে না করে, গোত্রহীন কাউকে বিয়ে করে এনেছ? জেনে-শুনে এই কাজ করেছ?

—না মা। তোমার পুত্রবধূ যথার্থই মালদেও-এর কন্যা।

—কিন্তু, তা কি করে হবে? তাহলে ভবানীর সব কথা অসত্য।

—না মা। ভবানী একটি মেয়েকে দেখতে পেত। সবাই তাকে আলাদা করে রাখত। সে বালিকা ছিল, অথচ তার সাজসজ্জা ছিল নিরাভরণ। মা এবং অন্যান্যদের অলঙ্কার দেখে পরতে চাইলে বকুনি খেত। সে অনেক খাবার খেতে পারত না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এক বিধবা মেয়ে ছিল বটে।

—অতি শৈশবে বিধবা হয়েছিল। সম্প্রতি জানতে পেরেছে যে সে বিধবা।

—তাই কি? কি বলতে চাও তুমি।

—সেই মেয়েই তোমার পুত্রবধূ।

তীব্র চিৎকার করে ওঠেন মা,---হাম্বীর।

—আমায় ক্ষমা কর মা। আমি প্রথমে জানতাম না। জানলে কখনই বসতাম না বিবাহে।

—ওরা ঠকিয়েছে?

—সে কথা বলতে পারো।

—সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করে চলে এলে না কেন? অত সৈন্য সামন্ত নিয়ে গিয়েছিলে। ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আসোনি কেন?

কেন আমাকে দিয়ে ওই বধূকে বরণ করালে?

—দোষ তো তার নয়।

—নিশ্চয় তার দোষ। সে বিবাহ বাসরে বলতে পারত যে সে বিধবা।

—হ্যাঁ। ওটি তার দুর্বলতা। ছেলেবেলা থেকে সে আমাকেই স্বামী বলে ভেবে এসেছে।

—মিথ্যে কথা। স্তোক বাক্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে জঘন্য প্রবঞ্চনা। পথে ওকে হত্যা করে রেখে আসা উচিত ছিল।

—সেই প্রস্তাব তোমার পুত্রবধূই দিয়েছিল। আমি মানিনি।

—কেন?

আমি বুঝেছি ওর মন অত্যন্ত পবিত্র। ও আমার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত। করেছেও অনেক কিছু।

—তোমাকে ভুলিয়েছে শয়তানী।

—না মা আমাকে কেউ ভোলাতে পারেনি। আমি তোমার ছেলে। তোমারই হাতে গড়া। আমার বিশ্বাস আমি ঠিকই করেছি। যদি না করে থাকি তাহলে দেবী নিজেই এর একটা বিহিত করবেন।

মায়ের মন বিপর্যস্ত। তিনি জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। বহুদিন পরে স্বামী অরি সিং-এর অভাব তিনি বোধ করেন প্রবল ভাবে। আজ স্বামী থাকলে কঠিন সিদ্ধান্তে আসতেন অতি সহজেই।

অবশেষে তিনি বলেন,—ওকে ডেকে পাঠাও। আমি প্রশ্ন করতে চাই।

কিছুক্ষণ পরে নব-বিবাহিতা এসে উপস্থিত হয়। সে নত হয়ে প্রণাম করে। সেই প্রণাম নিতে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা অনুভব করেন মা। কিন্তু হাম্বীরের মুখের দিকে চেয়ে সেই দ্বিধা কাটিয়ে ওঠেন। এমন কি আশীর্বাদও করেন।

—তোমায় একটি প্রশ্ন করতে ডেকে পাঠিয়েছি।

বধূ বিনম্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—বিবাহের আগে তুমি নিশ্চয় জানতে তুমি বিধবা।

একটু কেঁপে ওঠে বধূ। তারপর বলে,—হ্যাঁ মা।

—সেকথা বিবাহ বাসরে দাঁড়িয়ে বলতে পারলে না কেন?

—প্রলোভন।

—কি বললে?

—প্রলোভনের জন্যে পারলাম না।

—কিসের প্রলোভন?

—আমি চিরকাল যাঁকে স্বামী বলে ধ্যান করে এসেছি, যাঁর জন্যে দিনের পর দিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এসেছি, তাঁকে এভাবে লাভের সুযোগ পেয়ে আমার বিবেক নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। আমি তো জানতাম না তখন যে আমি বিধবা। জানলে, কখনই এমন হতো না। আমি যদি বিধবা না হতাম, আর যদি আপনার পুত্রের সঙ্গে বিয়ে না হতো তাহলে চিরকাল কুমারীই থাকতে হত।

—সেটা সম্ভব হত না।

—যদি না হত, তাহলে আত্মহত্যা করতাম। আপনি বলুন মা, অন্যত্র বিবাহ কি সম্ভব?

—আমি কিছুই বলব না। তোমার ওই প্রলোভন সূর্য বংশে বিরাট এক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আমি চাই তোমার মৃত্যু হোক।

—হ্যাঁ মা। আমিও সেই কথা বলছিলাম। আপনার পুত্র শুনলেন না।

—যা হোক, এখন তাই করতে হবে।

—আমি তাহলে কোথায় বসব বলুন। আমি শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা

করতে চাই মরণের সময়ে। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, পরের জন্মে যেন আপনার পুত্রবধূ হতে পারি।

মা বিচলিত বোধ করেন। মেয়েটির ভয়-ডর বলতে কিছুই নেই। এ কি অভিনয়? তিনি বলেন,—এইখানেই বস। তুমি আত্মহত্যা করতে পারো না?

—হ্যাঁ পারি। একটু সাধনা করে নেবার অনুমতি দিন তাহলে।

বধূ পাষাণের ওপর বসে চোখ বন্ধ করে। হাম্বীর ও তার মা পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে। হাম্বীরের চোখে আকুতি।

সহসা ওরা দেখতে পায় বধূ বিদ্যুৎ গতিতে কোমর থেকে একটি ছুরিকা বার করে নিয়ে বুকে বিঁধিয়ে দিতে উদ্যত। হাম্বীর ছুটে আসার আগেই তার মা কী যেন করেন। দেখা যায় ছুরিকা দূরে ছিটকে পড়ল।

বধূ বলে ওঠে,—এ কি করলেন মা?

মা বধূকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন,—তোমাকে অগ্নিপরীক্ষা করে নিলাম। সীতার কথা জানো না?

বধূ অঝরে কেঁদে চলে।

—হাম্বীর এবারে তুমি যেতে পার। তোমার কাজ শেষ।

হাসি মুখে হাম্বীর বলে,—তা তো যাচ্ছি। কিন্তু তুমি কী করে ওকে রক্ষা করলে মা। আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতি তোমার।

—অনেক ধীর হয়ে গিয়েছি। তোমার বাবা যা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বছর ঘুরতেই কৈলওয়ারা আর এক আনন্দে উৎসব-মুখর হয়ে উঠল। এতবড় উৎসব চিতোরগড়ে বহুবার হয় বছরে। কিন্তু কৈলওয়ারায় বোধহয় এই প্রথম। প্রতিটি নাগরিকের মুখে এত হাসি, তাদের মনে এত উচ্ছ্বাস কোন সাধারণ ঘটনায় ঘটে না। কিংবা বৎসরান্তে যে উৎসব ফিরে ফিরে আসে, তাতেও এমন হয় না। অপ্রত্যাশিত কোন কিছুতেই শুধু এমন হওয়া সম্ভব। প্রত্যাশিত অথচ অপ্রত্যাশিত। তা তো বটেই। সূর্যবংশের ধারায় ছেদ পড়ার কথা কেউ ভাবতে পারে? তাই এই আনন্দ। রাণীমার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মেবারবাসীরা কত নিশ্চিন্ত।

রাজপুত্রের নাম রাখা হল ক্ষেত্র সিং। আর এই নামকরণ অনুষ্ঠানের পরই জাল এসে হাম্বীরের সামনে দাঁড়ায়। চিতোর থেকে হাম্বীর তাকে যৌতুক স্বরূপ থেকে নিয়ে আসার পর থেকে জালের কোনরকম সক্রিয়তা লক্ষ্য করেনি হাম্বীর।

সে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিল।

অনেক সময় হাম্বীর কোন ব্যাপারে জালের পরামর্শ চেয়েছে। জাল জবাব দিয়েছে—আপনি যা ভেবেছেন তাই করুন।

—আমি কি ভেবেছি জানো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারপর জাল সত্যি সত্যিই হাম্বীরের মনের কথাগুলোকে বলে দিয়েছে।

অবাক হয়ে হাম্বীর প্রশ্ন করেছে—কি করে জানলে?

—আপনি মহারাণা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আপনার সিদ্ধান্ত অন্য রকম হবে কেন?

—তাহলে তোমায় চেয়ে নিয়ে এলাম অনর্থক?

—না, সময় হলে কাজে লাগব নিশ্চয়।

সেই জাল নিজে থেকে হাম্বীরের সামনে এসে দাঁড়ায় কিছু বলবে বলে। সুতরাং হাম্বীরের আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

—বল জাল।

—মহারানা, রাজপুত্র সূর্যবংশের সন্তান। এঁর চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আশীর্বাদ প্রয়োজন।

—কি করে?

—সেখানে গিয়ে মন্দিরে পূজো দিতে হবে। আপনার পুত্রকেও সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাম্বীর একটু ভেবে নিয়ে বুঝতে পারে, জাল কোনরকমের জাল ফেলার ফন্দি এঁটেছে। নইলে এতদিন পরে হঠাৎ এমন নড়েচড়ে উঠলে কেন?

সে বলে,—নিয়ে যাব বললেই তো হবে না। চিতোর থেকে অনুমতি না পেলে?

—ঠিক বলেছেন মহারাণা। অনুমতির জন্য মালদেও-এর কন্যা পত্র লিখবেন। রাও মালদেও নিশ্চয় অনুমতি দেবেন। এতো খুব পবিত্র কর্তব্য। তাছাড়া দৌহিত্রের মুখ দেখার কামনাও তো থাকা উচিত তাঁর।

—হুঁ। বেশ আমি রাণীকে বলব পত্র লিখতে। কিন্তু এসব তো গেল বাইরের ব্যাপার? আসল কথাটি বল তো?

জালের মুখে সাধারণতঃ হাসি দেখা যায় না। তবু মহারাণার কথা শুনে তার মুখখানা হাসি হাসি হয়ে উঠল। সে বলে—মহারাণী পুত্রকে নিয়ে প্রাসাদে থাকার সময় যাচাই করে দেখবেন প্রাসাদ রক্ষীদের সবাই এখন মহারাণাকে মনেপ্রাণে চায় কিনা। কাজ অনেক আগে থেকেই আমি শুরু করে দিয়েছি।

—কাজ শুরু করে দিয়েছ? অথচ আমি জানি না?

—চিতোরগড়ের ব্যাপারটা নিজেই দেখছি। আপনাকে বিরক্ত করিনি।

—ভালই করেছ। তারপর?

—তারপরের ঘটনা খুব সহজ। এখন মহারাণা, তাড়াতাড়ি পত্র দেবার ব্যবস্থা করুন।

পত্রের জবাব আশাতিরিক্ত তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল। রাও মালদেও সানন্দে অনুমতি দিয়েছে। সেই সঙ্গে জামাতা কন্যা আর দৌহিত্রকে আশীর্বাদ জানিয়েছে আর জানিয়েছে, দিল্লীর সুলতান যখন তার সহায় তখন জামাতার পক্ষে চিতোর-গড় দখলের চিন্তা না করাই সঙ্গত। এই ধরণের চিন্তা শরীরের পক্ষে ভাল নয়। বরং মেবার রাজ্যটিকে মোটামুটি ভাগাভাগি করে নিলে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে।

পত্র পাঠ করে হাম্বীরের মাথা গরম হয়ে ওঠে। তবে সে জানে এক বছরের মধ্যে তার দিক থেকে কোনরকম আক্রমণ হয়নি বলেই মালদেও এই জাতীয় পত্র লিখতে সাহসী হয়েছে।

কিন্তু জাল চিঠির সারমর্ম দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠল। পত্রের শেষ ছত্রটি তার মনোযোগ কেড়ে নিল। তাতে মালদেও জানিয়েছে এবারের মত দৌহিত্রকে দেখার সৌভাগ্য তার হবে না। কারণ তাকে সুলতানের আদেশে যুদ্ধযাত্রা করতে হচ্ছে। অর্থাৎ যেটুকু প্রতিরোধের আশঙ্কা ছিল, তাও রইল না।

চিতোরগড় দখল শেষ পর্যন্ত যে হেলেখেলায় পর্যবসিত হবে স্বপ্নেও ভাবেনি হাম্বীর এই কাজে জালের অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সংগঠন ক্ষমতার যে আশ্চর্য প্রমাণ পেল হাম্বীর তাতে মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে মনে স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল সে। কত আগে থেকে লোকটিকে সে বেছে রেখেছিল।

ঘটনাটা কিছুই নয়!

রাণী আর পুত্রকে চিতোরগড়ে কিছু লোকজন সমেত পাঠিয়ে দিয়ে সৈন্যদল নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে একটি পাহাড়ের আড়ালে। ঠিক ছিল, প্রাসাদ থেকে ইঙ্গিত পেলেই সে অভিযান চালাবে।

দুদিন ধরে তারা অপেক্ষা করে। ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই। লাল সিং ছটফট করে। তার মুখে মাঝে মাঝে হতাশা, কখনো বা বিরক্তি ফুটে ওঠে।

হাম্বীর লক্ষ্য করে বলে—এত অধৈর্য হচ্ছ কেন লাল সিং? ব্যাপার কি?

লাল সিং লজ্জিত হয়। নিজের গালে চপেটাঘাত করতে ইচ্ছে হয়। সে বলে,

—কিছু না মহারাণা। গড় দখল করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

—সে তো আমিও হয়েছি।

—হ্যাঁ, মহারাণা। আপনি তো হবে নাই। আপনার স্ত্রী পুত্র—বলতে গেলে সর্বস্বই তো ওখানে।

লাল সিং কি করে মুখ ফুটে বলে যে চিতোর দখল করলে লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ মিলবে। কতদিন দেখিনি তাকে। এক বছরের ওপর হতে চলল। এতদিন কি লক্ষ্মী অপেক্ষা করে বসে রয়েছে তার জন্যে? সেদিন অবশ্য বলেছিল তাকে ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে পারে না। ওসব উচ্ছ্বাস কি ধোপে টেকে? তার দাদা যদি অনুরোধ করে, সে ফেলবে কি করে? তেমন যদি কিছু ঘটে যায়? কিংবা যদি আত্মহত্যাই করে বসে? লক্ষ্মীকে না পেলে তার জীবন হয়ে পড়বে লক্ষ্মীছাড়া।

হাম্বীরও বাইরেই শুধু শান্ত। ভেতরটা তার ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ। দুই পুরুষ পরে চিতোরগড় অবার স্বাধীন হবে। সবকিছু নির্ভর করছে তার সাফল্যের ওপর। সে ডান হাত দিয়ে অসির হাতল স্পর্শ করে। স্পর্শ করলেই এক অসাধারণ শক্তি অনুভব করে অন্তরে। দেবীর কথা মনে পড়ে। বলেছিলেন যে, তাঁর ভুখা আর নেই।

সেই সময়ে দূরে দিকচক্রবালের পটভূমিতে ফুটে ওঠে এক ঘোড়সওয়ারের মূর্তি। সে ধুলো উড়িয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। আশান্বিত হয়ে ওঠে সবাই। লাল সিং-এর আর দেরি সয় না। ঘোড়সওয়ার কাছে আসার আগেই সে তার ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায়। তারপর তারা দুজনে ছুটতে ছুটতে আসে। লাল সিং-এর মুখে হাসি আর ধরে না।

লোকটি হাম্বীরকে বলে,—প্রাসাদের সবাই আপনার পক্ষে মহারাণা। মালদেও-এর সামান্য কিছু লোক রয়েছে বটে, তবে তারা সংখ্যায় এতই নগণ্য যে বাধা দিতে সাহস পাবে না। তাছাড়া কৌশলে তাদের কর্তব্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাম্বীর তার সৈন্যদল নিয়ে ছুটল না। সে শান্তভাবে যাত্রা করল তার পূর্বপুরুষের রাজধানীতে। ঠিক যেন খড়্গ-স্বপ্নের উৎসব শেষে নিজের প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করছে।

আর হলও ঠিক তাই। চিতোরবাসীরা কোন এক রহস্যজনক উপায়ে খবর পেয়ে গিয়েছিল তাদের মহারাণা এতদিন পরে আবার ফিরে আসছে। কতদিন পর? যারা বৃদ্ধ তারা মহারাণার রাজত্ব দেখেছে বটে। যারা প্রৌঢ় তারা তখন ছিল শিশু কিংবা বালক। মনে নেই কিছু

জয়ধ্বনির মধ্যে হাম্বীর প্রাসাদে প্রবেশ করে। তাকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা

জানায় তারই সহধর্মিনী।

—তোমার আত্মীয়স্বজনরা?

স্ত্রী বলে,—তাদের একদিকে সরিয়ে দিয়েছি। প্রহরী রাখা হয়েছে।

—তোমার দুঃখ হচ্ছেনা?

—দুঃখ? কাদের জন্যে? যারা অন্যায়ভাবে গড় দখল করেছিল এতদিন—তাদের জন্যে?

—না। তাদের জন্যে নয়। যারা অন্যের কৃতকর্মের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে যায়। তোমার মা তোমার ভ্রাতৃবধূ এরা।

—ওদের ব্যবস্থা যাদের করা উচিত তারাই করবে। আমি ওদের অপমানিত করিনি।

হাম্বীর স্ত্রীর চোখের দিকে ভালভাবে দৃষ্টিপাত করে। সেই চোখে অনন্ত বিশ্বাস আর প্রেম।

—ক্ষেত্র কোথায়?

স্ত্রী হেসে ফেলে।

—হাসলে যে।

—দেখবে এসো, তোমার পুত্র কোথায়। সে মহারাণা লক্ষ্মণসিং-এর সিংহাসনের ওপর শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। ওটার ওপর ওর দাবী রয়েছে।

হাম্বীর হেসে ওঠে। বলে,—সে তো বটেই। কিন্তু তার আগে একটা কাজ বাকী।

সে লাল সিংকে নির্দেশ দেয় প্রাসাদের শীর্ষে সূর্যবংশের পতাকা উত্তোলন করতে।

একটু পরেই সারা চিতোরবাসী দেখে তাদের অতিপ্রিয় পতাকা চিতোরগড়ের চূড়ায় মৃদুমন্দ বাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। দেখে চিতোরের লোকেরা আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। আহা! কতদিন পর—

দিল্লীর সুলতানের আদেশ পালন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে মেবারে প্রবেশ করেই মালদেও দুঃসংবাদটা পেয়ে গেল। হতাশায় ভেঙে পড়ে সে। বুঝতে পারে তার নিজের কন্যার অকাল বৈধব্যের জন্যে যাকে সে কোনদিনই সুনজরে দেখত না, সূর্যবংশকে হেয় করার জন্যে যার সঙ্গে কৌশলে সে হাম্বীরের বিবাহ দিল—সেই কন্যাই শেষ পর্য্যন্ত তার সর্বনাশের মূল হলো। কিন্তু এখন বুঝে আপাতত কোন লাভ নেই। লাভ যে নেই, একথা বুঝতে তার দুদিন নষ্ট হয়েছে।

ভেবেছিল, চিতোরে গিয়ে হাম্বীরের বাহিনীকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখল যে দলে দলে মেবারবাসী পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল আর গ্রাম ছেড়ে এগিয়ে চলেছে।

মালদেও-এর একপুত্র তাদের প্রশ্ন করে—কোথায় চললে সব?

—কোথায় আবার? জানো না, আমাদের মহারাণা চিতোরে ফিরে এসেছেন। চলেছি তাঁর দর্শনে। কতদিন দর্শন পাওয়া যায়নি। তা তোমরা কারা? আমরা তো ভেবেছিলাম রাণার সেনাটেনা হবে বুঝি। কথার ধরণে তেমন মনে হচ্ছে না। কারা তোমরা?

মালদেও-এর পুত্র জবাব দিতে পারে না।

—কথা কইছ না কেন? রাজার ছেলের মত পোষাক তো চাপিয়েছো। বোবা হয়ে গেলে কেন?

আর একজন মেবারবাসী বলে ওঠে,—তাহলে বোধহয় সেই দল।

—কোন্ দল?

—দিল্লীর সুলতান যাদের বসিয়ে দিয়েছিল।

—তাই নাকি? তোমরা সেই দল নাকি গো? আমাদের বারোজন রাণাকে হত্যা করে সুলতান আলাউদ্দিন যাকে বসিয়েছিল?

মালদেও-এর পুত্র বলে,—যাও যাও। যেখানে যাচ্ছ যাও।

একসঙ্গে তিন চার জন সর্দার সামনে এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়ায়,—যাব মানে? দেখবে তবে? মহারাণা হবার সখ ঘুচিয়ে দেব।

একটা খণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যাবার উপক্রম হয়। শেষে মালদেও নিজে ছুটে এসে সর্দারদের বুঝিয়ে শান্ত করে অনেক কষ্টে। সে জানে, এদের গায়ে হাত দিলে সমস্ত মেবার ক্রোধে ফেটে পড়বে। মেবারে এদের স্থান অত্যন্ত সম্মানের।

ওরা বিদায় নিতেই জ্যেষ্ঠপুত্র হরিসিং রাগে জ্বলে ওঠে। কোনদিনই মেবারের রাণা-বংশকে সে সহ্য করতে পারে না। হাম্বীরের সঙ্গে বিধবা বোনের বিয়ে দিতে তার ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু তার কথা কেউ শুনতে চায়নি। এখন ফলভোগ করতে হচ্ছে। কপালে আরও কত দুঃখ রয়েছে কে বলতে পারে? তার ভাই বনবীরই নষ্টের গোড়া। মেবারের রাণার প্রতি তার কেমন একটা দুর্বলতা রয়েছে! হীনমন্যতায় ভোগে বনবীর। মুখে কিছু না বললেও, স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

হরিসিং বলে,—এবারে কি করবে শুনি? পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?

মালদেও ধমকে ওঠে,—চুপ কর। অধৈর্য হলে চলে না।

—তুমি তো চিরকালই চেঁচিয়ে আমাকে থামিয়ে দাও।

—তার কারণ চিরকালই তুমি অবুঝের মত কথা বল।

—আর তোমার বুদ্ধিমান পরামর্শদাতারা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা বলে? এখনো শিক্ষা হয়নি? এবারে কি করবে?

—দিল্লী যাব। সুলতানের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলব। তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। হাম্বীরের মহারাণা-গিরি দুদিনেই ঘুচে যাবে।

হরিসিং চুপ করে যায়।

পুত্র ক্ষেত্রকে আদর করছিল হাম্বীর। সবে সকাল হয়েছে। স্ত্রী এসে বলে,—ওকে আমার হিংসে হচ্ছে।

—আমারও অমন হিংসে হয়।

—তাই নাকি? জানতাম না তো?

—অন্যের খবর কে রাখে?

স্ত্রী হেসে বলে,—এবার থেকে রাখব।

হাম্বীর পুত্রের পাশে শুয়ে পড়ে বলে,—এখন থেকেই রাখো।

স্ত্রী হেসে গড়িয়ে পড়ে।

হাম্বীর উঠে বসে বলে,—তোমার বাবার আর কোন খবর পাচ্ছি না। দিল্লীর পথে রওনা হবার পর থেকে একেবারে চুপচাপ।

—তুমি প্রস্তুত থেকো! আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুলতানকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবেন। বাবাকে আমি চিনি। চিতোরগড়ে ফিরে আসতে সব চেষ্টা করবেন। জামাতার জীবনও তুচ্ছ!

—জানি। তোমার ভ্রাতৃ বধূদের খবর কি?

—কালকে চাপা কান্নার আওয়াজ শুনে ওদিকে গিয়েছিলাম। দেখি বনবীরের স্ত্রী কাঁদছে। কষ্ট হল দেখে। ভাবলাম সান্ত্বনা দেব। কিন্তু কাছে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই ছুটে এল একসঙ্গে। যা খুশী বলে গালাগাল দিল। মা আমাকে বিধবা হবার অভিশাপ দিল। চলে এলাম।

—ওদের দোষ কি?

—তবে বুঝি দোষ আমার? আমি আমার স্বামীকে তার ন্যায্য অধিকার বুঝে নিতে সামান্য সাহায্য করেছি। এটা দোষ?

—ওরা তাই ভাবে। পৃথিবীতে উদার দৃষ্টিভঙ্গী কয়জনারই বা আছে। সবাই নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সব কিছুর বিচার করে। স্বার্থরক্ষার জন্যে কতরকম যুক্তি খাড়া করে।

একজন পরিচারিকা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। হাম্বীর বিরক্ত হয়। এই সময়টুকু তার নিজস্ব। এরপরে সারাদিন কাজ আর কাজ। এই সময়ে কোনরকম বাধা সে মোটে পছন্দ করে না।

স্ত্রী হাম্বীরের মনোভাব বুঝতে পারে। প্রশ্ন করে পরিচারিকাকে,—এখন হঠাৎ কী দরকার তোমার?

সে সঙ্কুচিত হয়ে বলে,—আমি আসতে চাইনি। কিন্তু লাল সিং বলে পাঠিয়েছেন। মহারাণার সঙ্গে জরুরী সাক্ষাতের প্রয়োজন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে হাম্বীর। সে পরিচারিকাকে বলে দেয় লাল সিং যেন অন্যসব সভাসদ্‌দের নিয়ে রাজসভায় হাজির থাকে। সে একটু পরেই যাচ্ছে। হাম্বীর জানে, লাল সিং সামান্য কারণে অধৈর্য হয় না।

সভাকক্ষে যাবার পথে জালের সঙ্গে দেখা হয় হাম্বীরের। সে-ও রাণার আদেশেই সভায় যাচ্ছিল। কোন খবর জানে না।

প্রবেশ করে দেখে প্রায় সবাই উপস্থিত। লাল সিং সামনের একটি আসনে বসেছিল। রাণার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ায়।

—কি খবর লাল সিং। জরুরী তলব দিয়েছ কেন?

—সংবাদ এসেছে মহারাণা। ওরা আসছে।

—কারা? মালদেও?

—হ্যাঁ। সুলতানও রয়েছেন সঙ্গে।

—তাই নাকি?

হাম্বীর একটু চিন্তান্বিত হয়। সংবাদটি খুব অপ্রত্যাশিত নয়। তবু নিজের শক্তিকে আর একবার যাচাই করে নেওয়া দরকার।

জাল বলে,—মহারাণা আমাদের আগের ব্যবস্থাই বহাল থাক।

—সিঙ্গুলির দিকে?

—হ্যাঁ মহারাণা। কোনরকমে সুলতানের বাহিনীকে পুবদিকে টেনে দিয়ে যেতেই হবে।

—তা তো জানি। ওখানে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে স্বয়ং আলাউদ্দিনও পরাস্ত হতেন।

লাল সিং হেসে বলে,—রাণা লক্ষ্মণসিংকে এই পরামর্শ দেবার জন্যে তখনো জালের জন্ম হয়নি।

এইসব রসিকতা সভার অন্য সবাই উপভোগ করলেও, জালের এতে হাসি ফোটে না।

—হুঁ। এবারে জাল বলুক কীভাবে সুলতানের বাহিনীকে ওদিকে নিয়ে

যাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জাল বলে,—এ ব্যাপারে আমি ব্যর্থ। আমি যোদ্ধা নই। যুদ্ধ করতে পারি বটে, কিন্তু সৈন্য পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা নেই। সুলতানকে কীভাবে সিঙ্গুলির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সে ভার স্বয়ং মহারাণার।

—আমিও যদি সফল না হই ?

জাল বলে,—তাহলে ভারতবর্ষের কেউ হবে না সফল।

—আমার ওপর তোমার গভীর আস্থা দেখছি। নাকি এও এক ধরনের তোষামোদ।

—আমি ঠিক তোষামোদ করতে পারি না মহারাণা। তবে আপনাকে তোষামোদ করে আনন্দ দিতে পারলে তৃপ্তি পেতাম। তবুও এইসব গুরুতর ব্যাপার নিয়ে তোষামোদ কখনো করতাম না। আমার যা বিশ্বাস সেই কথাই জানালাম।

—আমার এই প্রতিভার পরিচয় কোথায় পেলে ?

—আপনার যুদ্ধের সব খবরই আমি রাখি। মুন্‌জাকে হত্যা করার সময় থেকে তার সূচনা। তারপর আপনি যেভাবে বারবার কৈলওয়ারার আশেপাশে মালদেও-এর বাহিনীকে পরাভূত করছেন, শুনে আমি চমকে উঠেছি। আসলে মালদেও-এর সৈন্য পরিচালনার কলাকৌশলে ছিল আমারই অবদান। কিন্তু প্রতিবারই দেখেছি আপনার প্রতিভা অনন্যসাধারণ।

হাম্বীর হাসে। বলে,—বেশ, তুমি যখন অকপটে স্বীকার করছ, তখন ভারটা আমিই নিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল লাল সিংকে ভার দেব।

জাল বাধা দিয়ে ওঠে,—না না মহারাণা কখনো নয়।

লাল সিং-এর আত্মসম্মানে ঘা লাগে। বলে, আমার বুদ্ধিকে অত ছোট নজরে দেখো না জাল

গম্ভীর জালের মুখে তিনমাস পরে হাসির তরঙ্গ খেলে যায়। সে বলে,—মহারাণা, লাল সিংকে সব সময় সম্মুখ যুদ্ধে পাঠাবেন। দুই হাজার শত্রু সেনার বিরুদ্ধে পাঁচশো সৈন্য দিয়ে লাল সিং-এর ওপর ভার ছেড়ে দেবেন। দেখবেন, শত্রুসেনা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে কখনো নয়।

—তার মানে, আমার মোটা বুদ্ধি। এই তো ?

সভার সবাই হেসে ওঠে। লাল সিংও না হেসে পারে না ?

জাল বলে,—তোমার বুদ্ধি যে খুব মোটা তা নয়। তবে তুমি সবসময় কী যেন ভাব। একটু অন্যমনস্ক। চিতোরের পথে পথে ঘুরে বেড়াও। অনেককে কি যেন জিজ্ঞাসা কর। মনে হয় পরশ পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছ।

লাল সিং-এর মুখ কেমন যেন হয়ে যায়! মনে মনে জালের তারিফ না করে পারে না। সত্যিই সে পরশ পাথরের সন্ধানে ঘুরে মরছে। লক্ষ্মীর সন্ধান নেই। কেউ বলতে পারে না। আসলে সে অতি মূর্খ! লক্ষ্মীর দাদা বাড়ী ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ। লক্ষ্মীর দাদার নামটা ভুলে বসে রয়েছে। ভেবেছিল দুনিয়াতে লক্ষ্মীকে সবাই চেনে। তার অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

লাল সিং-এর ভাবান্তর হাম্বীর লক্ষ্য করে। বলে,—কি ব্যাপার লাল সিং?

—কিছু না মহারাণা। জালের বুদ্ধি কল্পনা রাজ্যেও ঘুরে বেড়ায়।

লাল সিং লক্ষ্য করে, জাল কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়: সে কি তবে অনুমান করতে পেরেছে? তার পক্ষে সবই সম্ভব।

বহু বছর আগে মেবার-বহ্নি পদ্মিনীর রূপের নেশায় পাগল হয়ে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন তাঁর অসংখ্য অনুচর নিয়ে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই চিতোরগড়েরই ওপর। তখন মেবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্ষুধার্ত।

সুলতান মহম্মদের অভিযানের কথা শুনে চিতোরের বৃদ্ধদের চোখের সামনে সেইদিনের ছবি ভেসে উঠল। তখন মেবারবাসীরা পরাজিতের মনোভাব নিয়ে বসে ছিল। তারা জেনে ফেলেছিল দেবী বারোজন রাণার রক্ত চান। তাই সেদিন সুলতান আলাউদ্দিনের বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্যে কোন বিশেষ যুদ্ধ কৌশল অবলম্বনের কথা কারও মাথায় আসেনি। মাঝে মাঝে সেই বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু এবারের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাণা এখন দেবীর আশীর্বাদধন্য। দেবী প্রদত্ত অসিতে তিনি বলীয়ান। তাছাড়া যুদ্ধবিদ্যায় এখনকার রাণার জন্মগত প্রতিভা। আর পৃথিবীতে আলাউদ্দিন খুব ঘন ঘন জন্মগ্রহণ করে না। সেবারে সুলতানের বাহিনী চিতোরগড়কে ঘিরে অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। এবারে সেই অবরোধের সুযোগ দেওয়া হবে না কিছুতেই। সবাই মনে মনে একটি জায়গার নাম উচ্চারণ করে। সিঙ্গুলি—সিঙ্গুলি। হ্যাঁ সিঙ্গুলিতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে সুলতান আর মালদেও-এর মিলিত বাহিনীকে। তাহলেই এবারের যুদ্ধের ফল মহারাণার করায়ত্ত।

সে-রাতে চিতোরগড়ের ওপরের আকাশ এক স্বর্গীয় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চিতোরবাসীরা বিস্ময়ে দেখতে লাগল ওপর দিকে চেয়ে। কীসের আলো? কোথা থেকে এল? দেবী মন্দিরে সেই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল। শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। সবাই বুঝল দেবীর আশীর্বাদ। আর এই আলো চোখে লাগতেই

মহারাণার অন্তঃপুরের এক নিভৃত প্রান্তে একজন মহিলা অচেতন হয়ে পাষাণের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তার হাতের ছুরিকা দূরে ছিটকে পড়ল। সে হল হরিসিং-এর স্ত্রী। প্রতিহিংসার তাড়নায় গোপনে আসছিল শিশু রাজপুত্র ক্ষেত্রসিংকে বধ করতে। সবাই দেখল তাকে। হাতীর দাঁতের হাতলের ছোট্ট ছুরিকাটিও কুড়িয়ে নিয়ে রাণীমাকে দিল একজন পরিচারিকা। কিন্তু হরিসিং-এর স্ত্রীর উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না কেউ। কারণ সবাই ব্যস্ত তখন যোদ্ধৃ বেশে সজ্জিত মহারাণাকে বিদায় দেবার জন্য। রাতের অন্ধকারেই হাম্বীর সসৈন্যে এগিয়ে যাবে সুলতান বাহিনীর সম্মুখীন হতে। শুধু তার স্ত্রী দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, মালদেও-এর পরিবারের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে এবার থেকে। ওদের বন্দী অবস্থায় বাকী দিনগুলো কাটাতে হবে। উপায় নেই।

রাত পোহাতেই রাণার সৈন্যদের পার্শ্ববর্তী পর্বতশীর্ষে দেখতে পেয়ে সুলতানের বাহিনী হতভম্ব হল। তারা ছুটে গিয়ে সুলতানকে খবর দেয়। অনেক যুদ্ধের অভিজ্ঞ দিল্লীর এই বাহিনী। সুতরাং প্রস্তুত হয়ে নিতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হল না। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি দেখে তল্পীবাহকেরা ওদের অনুসরণ করবে।

মালদেও উত্তেজিত হয়ে সুলতানের শিবিরে প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে বলে,—এখুনি ওদের আক্রমণ করতে হবে খোদাবন্দ্। হাম্বীরের ক্ষমতার কথা আমার জানা আছে। এটা ওর একটা চাল। তাড়া করলে পালিয়ে যাবার পথ পাবে না।

মহম্মদ গম্ভীর হয়ে বলে,—কিন্তু ওরা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। পাহাড়ের ওপরে উঠে তাড়া করা সম্ভব নয়।

মালদেও আর কোন কথা বলতে পারে না। সুলতান বিরক্ত হয়। ভাবে, পিতা একজন অপদার্থকে চিতোরগড়ের ভার দিয়েছিলেন। তারই ফলে এই দুর্গতি।

সেই সময় সিপাহ সালার এসে বলে,—ওদের কাবু করতে বেশী দেরী হবে না!

সুলতানের চোখে কৌতুহল। প্রশ্ন করে,—কি রকম?

—আপনি হুকুম দিলে পাহাড়টাকে ঘিরে ফেলতে পারি। ওদের কাছে রসদ আছে বলে মনে হয় না।

মালদেও চেঁচিয়ে ওঠে,—হ্যাঁ জাঁহাপনা, ঘিরে ফেলতে হবে পাহাড়টাকে।

ক্রোধে ফেটে পড়ে সুলতান,—চুপ করুন। দূর হয়ে যান সামনে থেকে।

ওপর থেকে হাম্বীর লক্ষ্য করে সবই। তার ওষ্ঠে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এই রকমই অনুমান করেছিল সে। এবারে তার কার্যক্রম হবে দ্রুত গিয়ে পেছনের পাহাড়ের শীর্ষে ওঠা। এর মধ্যে একটা ঝুঁকি রয়েছে। সুলতান বাহিনীর মধ্যে

কোন দক্ষ সেনাধ্যক্ষ থাকলে এখনই পেছনের পাহাড়টির সামনে গিয়ে ব্যূহ রচনা করতে পারে। তাহলে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। লোকক্ষয় হবে কিছুটা। তবে বেশী নয়। কারণ সুলতানের বাহিনীর একটা বিরাট অংশ এই পাহাড়-টিকেই ঘিরে রাখতে ব্যস্ত থাকবে। সমগ্র শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়বার সুযোগ পাবে না।

হাম্বীর দেখে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শত্রুরা দুভাগে ভাগ হয়ে পাহাড়ের দুদিকে চলেছে। সে আরও দেখে একদল অশ্বারোহীকে নিয়ে একজন যুবক প্রস্তুত হচ্ছে। সে তার সৈন্যদল নিয়ে পেছন দিকে নামতে শুরু করে। সুলতান-বাহিনীর হুংকার তার কানে আসে।

পেছনে তখনো ওদের বাহিনী এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু সেই অশ্বারোহী দলটিকে হাম্বীর দেখতে পায়। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে তারা পরের পাহাড়টিকে লক্ষ্য করে। মনে মনে প্রশংসা না করে পারে না হাম্বীর। কে ওদের দলপতি? এমন বুদ্ধিমান একজন লোককে মেবারের সৈন্যদলে পাওয়া যায় না? ওদের দলপতি যুবকটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। সবার সামনে সে চলেছে দৃঢ় ভঙ্গিতে। ওদের আগে ওই পাহাড়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ ওরা সমতলভূমিতে ঘোড়া ছুটিয়েছে। আর হাম্বীরকে নীচে নামতে হচ্ছে। ওদের অশ্বারোহীর সংখ্যাও প্রায় সমান সমান।

ছুটে চলে হাম্বীরের দল। এই প্রতিরোধ ভেদ করে এগিয়ে যেতে পারলেই—সিঙ্গুলি।

সে চলতে চলতে সওয়ারদের উৎসাহিত করে। চিৎকার করে বলে,—দেবীর আশীর্বাদ রয়েছে আমাদের। কোন দ্বিধা নেই। অনেক সাধের চিতোর আমাদের। তোমাদের বীরত্বের ওপর আজ সব কিছু নির্ভর করছে। এগিয়ে চল। ছিন্ন ভিন্ন করে দাও ওদের প্রতিরোধ ব্যূহ।

চিৎকার করে ওঠে মেবারের অশ্বারোহীরা।

তাদের দুর্দান্ত আক্রমণে সুলতানের অশ্বারোহীরা পেছু হটে যায় প্রথমটা। দু'পক্ষের পাঁচ-ছয়জন ঘোড়া থেকে পড়ে যায় আহত অবস্থায়। হাম্বীর এবারে ভাল করে দেখে ওদের দলপতিকে। সত্যিই অসাধারণ। সে তলোয়ার হাতে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে হাম্বীরের দিকে। হাম্বীর নিজেই তখন দলপতির সম্মুখীন হবার জন্যে তৎপর হয়। কিন্তু তাদের মাঝে দুইপক্ষের অনেক অশ্বারোহী। বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়।

তবু তারা এক সময় সামনাসামনি হয়। দলপতি প্রচণ্ডবেগে তাকে আক্রমণ করে। হাম্বীর তার তলোয়ার ওঠায় আকাশের দিকে। পরমুহূর্তেই দলপতির

অসি ভেঙে যায়। শুধু হাতলটুকু অবশিষ্ট থাকে তার বজ্রমুষ্টিতে। সে বিস্মিত! সে বিচলিত।

হাম্বীর তাকে বধ করে না। তারই বয়সী এই পাঠান যুবক। এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আজ দেবী-প্রদত্ত অস্ত্র তার হাতে না থাকলে ফলাফল বিপরীত হতে পারত। কারণ সবদিক দিয়েই সে তার সমকক্ষ। হয়ত কোন বিষয়ে তার চেয়েও বড়।

ঠিক সেই সময়ে পেছনে কোলাহল শুনে দিষ্টিপাত করতেই সে দেখতে পায় শত্রুবাহিনী একেবারে এগিয়ে এসেছে। সর্বনাশ। যে-কোন ভাবে এই মুহূর্তেই পাহাড়ে উঠতে হবে। নইলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।

দলপতি ইতিমধ্যে আর একটি তরবারি সংগ্রহ করে তার অশ্বারোহীদলকে সুসংবদ্ধ করছে। তার মুখে পরিতৃপ্তির আভাষ। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে তার। ওকে আর একমুহূর্তও সুযোগ দেওয়া চলতে পারে না।

তরবারি উঁচিয়ে সে ইঙ্গিত করে—এগিয়ে চল।

আর তখনই একটা তীর এসে বাঁ বাহুতে বিদ্ধ হয়। তাড়াতাড়ি সেটি তুলে ফেলে সে। রক্তপাত হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছে। তার প্রিয় যোদ্ধা লাল সিং-এর উরুতে বিদ্ধ হয় একটি। লাল সিং-এর মুখ বিকৃত হয়। অনেক কষ্টে সে তীরটিকে উপড়ে ফেলে দেহ থেকে। তারপর দূরে নিক্ষেপ করে।

কিন্তু তীর ছুঁড়ছে কারা? সুলতান বাহিনী তীর নিক্ষেপে আদৌ পারদর্শী নয়। তীর-ধনুক তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রের অঙ্গও নয়। তবে?

পেছন দিকে ফিরলে চোখে তীর লাগতে পারে। তবু হাম্বীর চকিতে একবার ঘাড় ফেরায়। সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ে হরিসিং আর বনবীরকে। এতক্ষণে বুঝতে পারে সে। তারই আত্মীয়। অর্থাৎ তার স্ত্রীর ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এদের ধমনীতে সেই একই রক্ত। হরিসিং দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তাকে লক্ষ্য করে আর একটি তীর ছুঁড়ছে। চিনতে পেরেছে ঠিক।

হাম্বীর প্রবল বিক্রমে সুলতানের অশ্বারোহীদের শেষ বারের মত আক্রমণ করে। এই আক্রমণ করতে গিয়ে তাদের শেষ ব্যূহ ভেঙে পড়ে। ছিটকে বার হয়ে যায় মেবারের বীরেরা। রক্তাক্ত লাল সিং সবার পেছনে। সুলতানের সৈন্যরা হতাশ দৃষ্টিতে দেখে মেবারের রাণা তার দলটিকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হরিসিং আফশোষ করে ওঠে,—ইস্। মারতে পারলাম না।

আবার পেছনে গিয়ে আটকাবার জন্যে ছোটে তারা।

কিন্তু পেছনেই মহারানার বহু-ঈপ্সিত স্থান সিঙ্গুলি।

হাম্বীরের সুনিপুণ কৌশলে শেষ পর্যন্ত সুলতান ফাঁদে পড়ে। এমন কি মালদেও নিজেও এই কৌশল বুঝতে পারল না। হাম্বীরকে ধরতে না পেরে সুলতান সসৈন্যে পূব দিকে গিয়ে সিঙ্গুলিতে শিবির স্থাপন করে।

সেখান থেকে পরের দিন হরিসিং দূত মারফৎ জানায়, হাম্বীর যদি সূর্য-বংশের সন্তান হয় তাহলে হরিসিং-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করুক। সেই সাহস না থাকলে বুঝতে হবে তার রক্ত খাঁটি নয়।

এতবড় অপমান বিনা কারণে কেউ কখনো করেনি হাম্বীরকে। তবু সে সংযত হয়ে দূতকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে।

স্ত্রীর কাছে গিয়ে সব কিছু বর্ণনা করে বলে,—তোমার ভাইকে আমি হত্যা করতে চাই না। কিন্তু মহারাণা হয়ে এই অপমান কী করে সহ্য করব?

—সহ্য করলে বুঝতে হবে আমার দাদা ঠিক কথাই বলেছেন।

হাম্বীর এই উত্তর প্রত্যাশা করেনি। বলে,—আমি তাহলে দূতকে বলে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ। ভেবোনা, দাদার মৃত্যু হলে আমার দুঃখ হবে না। কিন্তু জীবনের চেয়েও বড় কিছু আছে জগতে যা অমূল্য।

—বুঝেছি। তোমার কথা শুনে মাঝে মাঝে আমি চমকে উঠি।

—তুমি? চিতোরের মহারাণা?

—হ্যাঁ।

কেন চমকায় সেকথা প্রকাশ করতে পারে না হাম্বীর। নিজের স্ত্রীর মধ্যে সে ভবানীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

পরদিনই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন করা হয়। সুলতান ভাবে, হরিসিং ভাল চাল চেলেছে। কোনরকমে সে হাম্বীরকে হত্যা করতে পারলে ঝামেলা পোহাতে হবে না আর। চিতোরগড় মালদেও-এর অধিকারে আসবে। তবে এবারে শত্রুর শেষ রাখতে দেওয়া হবে না। হাম্বীরের শিশুপুত্রকে বাঁচতে দেওয়া চলতে পারে না।

সুলতানের ইচ্ছে ছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হবে, শিবিরের কাছাকাছি কোথাও। যাতে হরিসিং নিহত হলেও হাম্বীরকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী সে একদল সেনার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। তারা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে

থাকবে। সময় বুঝে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু হাম্বীর রাণা লক্ষ্মণ সিং বা ভীম সিং নয়। তাছাড়া সুলতানের পিতা আলাউদ্দিন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন একবার, তারপর থেকে রাজপুতরা অনেক সচেতন হয়েছে। রাজপুত-সুলভ উদারতায় সুড়সুড়ি দিয়ে আর কাজ হয় না।

হাম্বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান নির্দিষ্ট করে খবর পাঠিয়েছে। সেটি সুলতানের শিবির থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া হরিসিং সঙ্গে মাত্র পাঁচজন অনুচর নিয়ে আসতে পারবে। রাণাও তাই নিয়ে যাবে। তবে রাণার চরেরা চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

হরিসিং রাজী হয়। সে পিতার কাছে গিয়ে বলে,—তোমার জামাতার কাটা মুণ্ডু নিয়ে ফিরে আসছি। মূর্ছা যেওনা।

—যদি পারো, আশীর্বাদ করব।

—এতদিনে আমাকে একটু গুরুত্ব দিচ্ছ দেখছি।

বনবীর মন্তব্য করে,—মৃত্যু পথযাত্রীকে সব সময় গুরুত্ব দিতে হয়। এটা ধর্ম সম্মত।

হরিসিং চেঁচিয়ে ওঠে।

মালদেও হাত তুলে বলে,—আঃ হরি। এখন মাথা গরম করতে নেই। তুমি যাও।

হরিসিং বনবীরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে ঝটিকা গতিতে বার হয়ে যায়। তারপর পছন্দমত পাঁচজন অনুচর নিয়ে কথায় বাজীমাৎ করতে করতে এগিয়ে যায়।

হাম্বীর অপেক্ষা করছিল। হরিসিংকে এগিয়ে আসতে দেখে সে হেসে অভিবাদন জানায়।

হরিসিং ওসব লক্ষ্য করে না। সে উদ্ধত ভঙ্গীতে কাছে এসে বলে,—আমি জানতাম, ভয় পেলেও তোমাকে আসতেই হবে। নইলে মুখ দেখাতে পারতে না। এবারে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও হাম্বীর। বোনটা বিধবা হবে। হোক। একবার যে বিধবা হয়েছে, তার দুবার হতেই বা ক্ষতি কি?

ওর আস্ফালন দেখে হাম্বীরের বহুদিন পরে সর্দার মুনজার কথা মনে পড়ে যায়। দুজনার মধ্যে কোথায় যেন এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে।

সে ধীর কণ্ঠে বলে,—আপনি আত্মীয়। আত্মীয়ের রক্তপাত আমি চাই না। মনে হয় এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ না হওয়াই ভাল।

চিৎকার করে ওঠে হরিসিং,—ভীরু কাপুরুষ। পালিয়ে যাবার মতলব। বলে, আমি ওর আত্মীয়। বিধবা বিয়ে করে বলে আত্মীয়। এই আত্মীয়তা দুই পায়ে

পিষে ফেলে থুথু ছিটিয়ে দিই।

হাম্বীরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সে শুধু বলে,—বল্লম, না তলোয়ার?

—তলোয়ারই হোক। ক্ষমতা দেখি একবার।

দেবীপ্রদত্ত তলোয়ার কোষ মুক্ত করে হাম্বীর। সে অপেক্ষা করে। হরিসিংই এগিয়ে আসুক।

হরিসিং ছুটে আসতেই হাম্বীর তলোয়ার উত্তোলন করে। আর সেইদিকে তাকিয়ে কেমন থতমত খেয়ে যায় হরিসিং।

আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—ওটা কি? কী ওটা?

—তলোয়ার। দেখেননি কখনো?

—না না। যুদ্ধ তবে থাক।

কঠোর স্বরে এবারে হাম্বীর বলে,—তা হয় না হরিসিং। একবার যখন অসি কোষ মুক্ত করেছি, আপনাকে মরতেই হবে। রাজপুতের নিয়ম ভুলে গেলেন?

—না না।

তার স্কন্ধচ্যুত শির কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে। আর মুণ্ডুহীন দেহটি অদ্ভুতভাবে আগের মতই বসে থাকে অশ্বের ওপর শক্ত হাতে লাগাম ধরে। সেই অশ্ব সুলতানের শিবিরের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে পাঁচজন অনুচরের পেছনে পেছনে।

হাম্বীরের অনুচরেরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। তবে তারা আরও একটু উত্তেজনা অনুভব করতে চেয়েছিল। হরিসিংকে এভাবে মরতে দেখে তারা হতাশ হয়।

রাণা হরিসিং-এর মুণ্ডুটি তুলে নিতে নির্দেশ দেয়। ওটি মালদেও-এর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। সে সৎকারের ব্যবস্থা করবে।

পুত্রশোকে মালদেও মুহ্যমান হল না আদৌ। তবে হাম্বীর সম্বন্ধে তার ধারণার আমূল পরিবর্তন হল। আর একটি বিষয়ে তার মন পুরোপুরি সাফ হয়ে গেল। পুত্রহন্তাকে সব সময়েই হত্যা করা যেতে পারে। সেখানে আত্মীয় বলে কোন বাছবিচার থাকতে পারে না।

মালদেও সুলতানকে উসকে দেয়। কিন্তু দিল্লীর সুলতান হলেই আলাউদ্দিন হওয়া যায় না। পৃথিবীতে আলাউদ্দিন খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন। যার ফলে, তারই পুত্র উত্তেজিত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু একবারও বুঝতে পারল না হাম্বীরের সযত্ন-নির্মিত খাঁচার মধ্যে সে আবদ্ধ। সে এবং তার সমগ্র বাহিনী হাম্বীরের সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত। আর বহির্গমনের প্রতিটি পথ রুদ্ধপ্রায়।

পরদিন যুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিপ্রহরের কিছুপরেই তার আত্মসন্তুষ্টির ভাব একেবারে কেটে যায়। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। সে লক্ষ্য করে, শুধু সামনে নয়, আশে-পাশে পেছনে সব দিকেই মেবার বাহিনী। তাদের সংখ্যা কত ঠাহর করা যায় না।

একবার সে একটি উপত্যকার দিকে সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করে। কিন্তু সেখানেও প্রবল বাধা। পাহাড়ের ওপর থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে বেঁধে সৈন্যদের গায়ে, বুকে মুখে। অসহায়ের মত তার সৈন্যরা মরতে থাকে।

পরদিনও একই দৃশ্য।

সুলতান ব্যর্থ ক্রোধে ফেটে পড়ে। মালদেওকে ডেকে পাঠায় তার শিবিরে। সে এসে পৌঁছতেই গলা ফাটিয়ে বলে,—তুমি অপদার্থ। তোমাকে কোতল করা উচিত এখনি।

—খোদাবন্দ্।

—এতদিন চিতোরে থেকেও বুঝতে পারোনি সেদিন ওরা আমাদের ফাঁদের দিকে নিয়ে চলেছে?

মাথা চুলকে মালদেও বলে,—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

—কী করে বুঝবে? বোকার হদ্দ তুমি? এতদিন মেবারে বসে মজা লুটেছ অথচ যুদ্ধের জন্যে কোন্ জায়গাটা উপযুক্ত একবারও দেখতে পারলে না? আমি ভুল করেছিলাম। তোমার ওপর নির্ভর করা আমার মারাত্মক ভুল হয়েছে। এবারে কি করবে?

—হুজুর ওরা দেখছি সব দিকেই রয়েছে।

—আমিও জানি। নতুন কথা কিছু নয়। কিন্তু এবারে উদ্ধারের কি ব্যবস্থা করবে? কোন পথ আছে?

—আমি জানিনা হুজুর।

সুলতান মহম্মদ পদাঘাত করে তাকে।

তবু মালদেও কুকুরের মত তার পায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। যে প্রভু আদর করে পদাঘাতের অধিকারও তার নিশ্চয় রয়েছে।

—জাঁহাপনা হাম্বীরের এত সৈন্য দেখে আর বিশ্বাস হচ্ছে না। নিশ্চয় অন্য কোন রাজা ওকে সাহায্য করছে।

—তুমি কিছুই জানো না। পরা পাহাড় পর্বত থেকে এসেছে রাণাকে সাহায্য করার জন্য। এরা চায় না তুমি চিতোরগড়ে ফিরে যাও। আমিও চাই না।

—দয়া করুন হুজুর। চিতোর চলে গেলে মরে যাব।

—তুমি মরলে আমার কিছু এসে যায় না। চিতোর কখনো আমার দখলে এলেও তুমি আর ওখানে ফিরতে পারবে না। ফিরতে দেব না আমি। নিশ্চিন্ত থাকো। তবে একটি সর্ত। আজকের মধ্যেই আমার বাহিনীকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলে বিবেচনা করে দেখব।

কিন্তু শত চেষ্টাতেও মালদেও-এর পক্ষে তা সম্ভব হল না। মাঝখান থেকে অনেক পাঠান এবং মালদেও-এর অনেক রাজপুত প্রাণ বিসর্জন দিল।

আরও দুদিন কাটল। হাম্বীর আরও দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরল সুলতানবাহিনীকে। ওদিকে কয়েকদিনের পুরোনো মড়ার দুর্গন্ধে চারদিকে ভরে উঠল। সবাই নাক চেপে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে আর মনে মনে মালদেও এবং সুলতানকে অভিসম্পাত দেয়।

শেষে একদিন নিজেই সৈন্য পরিচালনা করার সময় সুলতান বন্দী হয়। সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

সুলতানকে হাম্বীরের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাম্বীর সুলতানের দিকে চেয়ে বলে,—আপনি বন্দী, একথা স্বীকার করেন?

—বাস্তবকে আমরা চিরকালই স্বীকার করি।

—খুশী হলাম শুনে। আপনি মুক্তি চান?

—অবশ্যই। কে না চায়?

—নিশ্চয় এটাও বাস্তব। তবে আর একটু বাস্তব হবেন আশা করি। আপনাকে মুক্তি দিতে পারি কয়েকটি স্থান এবং মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে।

সুলতান মাথা নেড়ে বলে,—অসম্ভব। আমি মানব না।

—হুঁ। আপনার অপমান হবে, তাই না।

—এ প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না।

—কিন্তু দিতে হবেই। হয়ত দুদিন সময় লাগবে। কারণ এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই।

—দিল্লীর সুলতানকে কোন রাজা বন্দী করতে পারে না।

—কথাটা অবাস্তব।

—কিন্তু এটাই শেষ কথা। আমাকে এখনো বসতে বলেন নি মহারাণা।

—বন্দীরা বসে থাকে না।

—কিন্তু আমি সুলতান।

—জানি। কারণ এখনো আপনি জীবিত আছেন।

—আপনি আমাকে হত্যা করবেন?

—এখনি বলতে পারি না। যদি সর্ত পালন করেন তাহলে দরকার হবে না।

—নইলে ?

—আপনার সঙ্গে কথা বলতে আর রাজী নই। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি। কোন সুন্দরীর প্রতি মোহের বশে মেবার আর কখনো নিজের বিপদ ডেকে আনবে না। দিল্লীর মসনদে যে-ই থাকুক না কেন।

মহারাণার ইঙ্গিতে রক্ষীদল সুলতানকে নিয়ে চিতোরের দিকে রওনা হয়।

এরপর মালদেও, তার পুত্র বনবীর এবং অন্যান্য কয়েকজনকে সামনে নিয়ে আসা হয়।

—রাও মালদেও।

—বলুন মহারাণা।

—বাঃ, আপনি দেখছি বেশ নমনীয়। শুনুন, আপনার বয়স যথেষ্ট। ওই আসনে বসুন।

মালদেও এতটা আশা করেনি। কৃতার্থ হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়ে। সত্যিই তার দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ছিলনা আর!

এবারে মহারাণা বনবীরকে আরও কাছে আসতে বলে।

—শুনুন বনবীর। আপনাদের আমি হত্যা করব না কখনই। আপনার ভাইকে আমি হত্যা করতে চাইনি। আপনি জানেন সেকথা ?

—হ্যাঁ। আমি ভালভাবেই জানি মহারাণা। সে মরেছে নিজের দোষে।

—আপনি আমার অধীনে কাজ করতে রাজী আছেন ?

—আমি রাজী।

—বন্দী অবস্থায় অনেকে অনেক কিছুতে রাজী হয়। আমি সেরকম চাইছি না। আমি চাই আপনি বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করবেন।

—আমি সবদিক ভেবেই রাজী হয়েছি। নইলে হতাম না। আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা কঠিন হবে না আমার পক্ষে। বিশ্বস্ততার পরিচয়ও দেবার চেষ্টা করব। আমার এই ক্ষুদ্র সামর্থ দিয়ে মেবারকে যতখানি পারি শক্তিশালী করার চেষ্টায় থাকব।

—আপনার মনোভাবে আমি খুশী হতাম। আমি আপনাকে চিতোরে থাকতে বলছি না। কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য আপনাকে দেব। আপনি তাই দিয়ে আপনার পিতা-মাতা আর পূজনীয়দের সম্মানের সঙ্গে প্রতিপালন করতে পারবেন। দুঃখ পাবেন না। চিতোরকে নিজের বলে ভাববেন না। ওই প্রাসাদ ওই রাজ্য আমার পূর্বপুরুষের। আমি ফিরে পেয়েছি মাত্র। ওর পাষাণ আমাদের পূর্বপুরুষের রক্তে এখনো সিক্ত।

বনবীর বলে ওঠে,—মহারাণার জয় হোক।

হাম্বীর উঠে দাঁড়িয়ে বনবীরকে আলিঙ্গন করে।

দিল্লীর সুলতান চিতোরগড়ে বন্দী। প্রায় তিনমাস হতে চলল। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। হাম্বীর অতিরিক্ত সতর্ক। সে জানে, সুলতানকে উদ্ধারের চেষ্টা যে কোন সময় হতে পারে। মেবারের প্রতিটি প্রান্তে তার অনুচরেরা দিন-রাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি দুর্গ সুরক্ষিত করা হচ্ছে। সর্দারদের বলা হয়েছে, তারা যেন সব সময় প্রস্তুত থাকে। খবর পেলেই যেন যুদ্ধযাত্রায় বিলম্ব না ঘটে।

হাম্বীর নিজেও জাল এবং লাল সিংকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। লাল সিং ভেবেছিল চিতোরগড় দখলের পরই সে বেরিয়ে পড়বে লক্ষ্মীর অন্বেষণে। কিন্তু এখনো সেই সুযোগ এল না জীবনে। প্রতিটি দিন চলে যাচ্ছে, আর লক্ষ্মীকে পাওয়ার আশা দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ কিছু করার নেই। দেশে যতদিন নিরাপত্তা না ফিরে আসছে, ততদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামানো চলে না। যদিও সে জানে তার জীবন মরুভূমি হতে চলেছে।

সেদিন হাম্বীর রাজসভায় এসেই খবর পেল, সুলতান তার দর্শন প্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে আসতে বলা হল।

সুলতানকে রাজসভায় নিয়ে আসা হয়। হাম্বীর দেখে মানুষটি অনেক শীর্ণ হয়ে পড়েছে। মুখের ওপর স্বাস্থ্যহীনতার ছাপ। দেখে তার রাগ হয়। সুলতানকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে বলা হয়েছিল। দিল্লীতে তার খাদ্য তালিকায় যা থাকত, সবকিছু দেবার ব্যবস্থা করতে বলেছিল। তবু কেন সুলতান এমন শীর্ণ?

এর জবাব সুলতানই দেয়। বলে,—কর্মচারীদের কোন অপরাধ নেই মহারাণা। আমি কোনরকম অসুবিধা ভোগ করছি না। আমার একমাত্র অসুবিধা আমার বন্দীত্ব। তাছাড়া ভেবে দেখুন আমার সম্মান ধুলোয় লুটিয়েছে। আমার স্বাস্থ্য কি করে বজায় থাকবে?

হাম্বীর সুলতানকে উপবেশনের জন্যে আসন দেখিয়ে দেয়।

সুলতান বলে,—এখনো আমি বন্দী। বসব কি করে?

—তবু বসতে বলছি। আপনি বন্দী হলেও মেবারের অতিথি। সদ্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনাকে আনা হয়নি। আপনি বসুন।

সুলতান আসন গ্রহণ করে।

হাম্বীর বলে,—দেখা করতে চেয়েছেন কেন?

দুঃখের হাসি হেসে সুলতান বলে,—আর একটু বাস্তববাদী হতে চাই।

—সর্ত পালনে প্রস্তুত তাহলে ?

—কী সর্ত আপনার বলুন ?

হাম্বীর বলে,—কয়েকটি স্থান ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে।

—কোন্ কোন্ স্থান ?

—আজমীর, রণথম্ভোর, নাগোর।

সুলতান একটু ভাবে। বুঝতে পারে, হাম্বীর অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এই জায়গাগুলো তাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলবে। তবু উপায় নেই। লোকটা ভদ্র হলেও অত্যন্ত জেদী। তার সর্ত পালন না করলে, সারাজীবন বন্দী করে রাখতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

সে বলে,—বেশ রাজী আছি। আর চাপ দেবেন না।

—সে কি সুলতান ? আপনার রাজ্য তো মেবারের মত এত ক্ষুদ্র নয়। দেবার ক্ষমতা আপনার প্রচুর। আর তাতে আপনি মোটেই দুর্বল হয়ে পড়বেন না।

—বলুন।

—আমাকে দিতে হবে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা আর একশো হাতী। খুব সামান্য। সুলতান আলাউদ্দিন এবং আপনি আমার রাজ্যের ও বংশের যে বিপুল ক্ষতিসাধন করেছেন, তার তুলনায় এ অতি সামান্য। এটুকু ক্ষতিপূরণ না করলে আপনার বন্দীত্ব জীবনেও ঘুচবে না।

হাম্বীরের স্বরে যথেষ্ট কঠোরতা। সুলতান সেই স্বরের অর্থ ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করে। বলে,—আমি রাজী। আমায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

হাম্বীর উঠে দাঁড়িয়ে সুলতানকে অভিবাদন জানিয়ে বলে,—সুলতান, আমি জানি সুযোগ পেলে আপনি চিতোরগড় আক্রমণ করবেন। তবু মুক্তি দিচ্ছি আপনাকে। আপনি বীর। বীরের সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাক্ষাতের আশায় রইব।

সুলতানের নিষ্ক্রমণের দিকে চেয়ে থাকে হাম্বীর। সে জানে, মেবারের সঙ্গে দিল্লীর বিবাদ কোনদিনও ঘুচবে না। ঘুচতে পারে শুধু দুটি কারণে। প্রথমটি হল, দিল্লী যদি কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পাশের রাজ্যগুলোতে অভিযান চালাবার মত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিংবা এই সূর্যবংশ যদি কখনো অবলুপ্ত হয় অথবা এই বংশে এমন কোন মহারাণা কখনো যদি জন্মায়, যে স্বাধীনতার মর্মকথা বুঝতে অপারগ। তাহলে কষ্টসহিষ্ণু হবার জন্যে শৈশব থেকে সে সাধনা করতে চাইবে না। ফলে হয়ে পড়বে বিলাসী এবং আরামপ্রিয়। তা যদি না হয় তাহলে বংশপরম্পরায় মেবারকে যুদ্ধক্ষেত্রে দিল্লীর আক্রমণের মোকাবিলা করতে

হবে।

জাল সিং বলে,—এবারে মহারাণা দেশের স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। আমাদের কর্তব্য কি?

হাম্বীর শুধু বলে,—দেশকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে হবে। তুমি দেখবে একখণ্ড জমিও যেন অনাবাদী পড়ে না থাকে।

জাল সিং বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এত অল্প কথায় এমন সোজাসুজি মহারাণা তার কর্তব্য বলে দেবে সে ভাবতে পারেনি। তার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় ভাবতে পারেনি। সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে মহারাণা শুধু সুদক্ষ যুদ্ধ বিশারদ নয়, একজন অতি উচ্চস্তরের শাসনকর্তা। সে গর্বিত হয়ে ওঠে।

লাল সিং এগিয়ে আসছিল কিছু বলার জন্যে। কিন্তু মহারাণা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয়। কী যেন শুনতে পেয়েছে সে।

হ্যাঁ, সেই সুর। খুব পরিচিত। সেই সঙ্গীত। কণ্ঠস্বরও একই রকম। রাস্তা দিয়ে চলছে মনে হচ্ছে।

হাম্বীর ভুলে যায় যে সে মহারাণা। রাজসভা থেকে ছুটে বার হয়ে যায়। উপস্থিত সবাই হতভম্ব। কী হল মহারাণার? অমন ধীর মস্তিষ্কের মানুষটি এত চঞ্চল হল কেন?

তারা মহারাণার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছেন মহারাণা। পেছনে সভাসদগণ। এমন দৃশ্য চিতোরগড়ের কেউ কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না। সবাই মহারাণাকে সম্মান দেখিয়ে পাশে সরে দাঁড়ায়। অনেকে আবার সভাসদগণের সঙ্গ নেয়।

একজন গান গাইছিলেন পথের ধারে। মুগ্ধ শ্রোতার দল তাঁকে ঘিরে ছিল। হাম্বীর পাগলের মত দুহাতে ভীড় সরিয়ে গায়কের চরণতলে গিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ গায়কের মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে ওঠে।

হাম্বীর বলে,—কবি আপনি আমায় দেখা না দিয়ে চলে যাচ্ছেন যে? আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

—তোমার কাছে আগে যাব কেন? আগে চিতোরগড় পরিক্রম করে সবাইকে গান শোনাব। তারপর দেবীর মন্দিরে গিয়ে প্রণাম জানাব। তবে তো তোমার কাছে যাব? তোমার কাছে তো আমার বিশ্রাম। তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ কেন হাম্বীর?

মাথা নীচু করে হাম্বীর বলে,—ক্ষমা করবেন। আমি স্বার্থপর হয়ে পড়েছিলাম।

চারণকবি উদার হাসি হেসে হাম্বীরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে গাইতে গাইতে এগিয়ে যান।

মহারাণার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে লাল সিং নেমে এসেছে সমতল ভূমিতে। সমস্ত চিতোর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে লক্ষ্মীর সন্ধান পায়নি। এখন একটি একটি করে গ্রামে খোঁজ করছে। তবু পাচ্ছে না। কতদিন হয়ে গেল।

চলে আসার সময় সে মনে মনে চিতোর দেবীকে প্রণাম জানিয়েছিল। প্রণাম জানিয়েছিল মহারাণাকেও। হয়ত আর সে ফিরবে না কোনদিনও। মনকে মরুভূমি করে রেখে ফিরে এসে কী লাভ? তাতে মহারাণার ক্ষতি হতে পারে।

সে এবারে নিজের গ্রামের দিকে পাড়ি দেয়। যদি কখনো মনের এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে তখন দেখা যাবে।

গ্রামে ফেরার পথে একটু ঘুরে লক্ষ্মীদের গ্রামখানাও দেখে যাবে একবার। বিশ্বাস হয় না ওখানে ফিরেছে বলে। তবু চোখের দেখা দেখতে হয়, তাই।

ক্রমাগত চলতে চলতে লক্ষ্মীর গ্রামে পৌছোয়। আশ্চর্য! গ্রামবাসীরা তাকে দেখে চিনতে পারে। তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। লাল সিং এদেরই দু একজনের সঙ্গে লক্ষ্মীদের কুটিরের সামনে এসে থামে। অনুমান তার মিথ্যে নয়। কুটির বন্ধ। জীর্ণ অবস্থা সেটির। অথচ অন্যান্য যে সমস্ত কুটির জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল, যেখানে হিংস্র পশুরা পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছিল। সেগুলো নতুন ভাবে সংস্কার করে নেওয়া হয়েছে। পূর্বের শ্রী ফিরে পেয়েছে।

নিরুৎসাহ লাল সিং লক্ষ্মীর দাদার কথা জানতে চায় গ্রামবাসীর কাছে।

ওরা বলে,—সেই বিশ্বাসঘাতক? হ্যাঁ, এসেছিল তার বোনের হাত ধরে। তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা।

—তাড়িয়ে দিলে?

ওরা হেসে বলে,—হ্যাঁ। কী করব? রাজপুত বলে শেষপর্যন্ত মেরে ফেলতে হাত উঠলো না।

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয় লাল সিং-এর। সে বলে,—ভালই করেছ।

কোনমতে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে আবার রওনা হয়। এবারে গ্রামে যেতে হবে। নিজের গ্রাম। চলতে থাকে সে। নিজের বাহনটিকে দানা দিতেও ভুলে যায় সে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে সামনের অরণ্যের দিকে। ওই অরণ্যের ভেতর দিয়ে গেলে তিনদিনের মধ্যে গ্রামে পৌঁছোতে পারবে। তবে তাড়া নেই কোন। যাদের কোন উদ্দেশ্য নেই, তাড়াও থাকে না তাদের।

ঘোড়াটিও যেন তার মনিবের মনোভাব বুঝে ফেলেছে। সে-ও হোঁচট খেতে খেতে চলে। অথচ দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে এই ঘোড়াই কী তৎপরতা দেখিয়েছিল!

অরণ্যের কাছাকাছি গিয়ে সে একজন শীর্ণ মানুষকে একবোঝা কাঠ বয়ে আনতে দেখে। লোকটা চলতে পারছে না। লাল সিং ভাবে, ওকে একটু সাহায্য করলে কেমন হয়?

কিন্তু সে কাছে যাবার আগেই মাথার বোঝা পথের ওপর ফেলে দিয়ে লোকটা বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

ঘোড়া নিয়ে কাছে দাঁড়ায় লাল সিং। বলে,—বোঝাটা ঘোড়ার ওপর তুলে দাও। তুমি তো দেখছি পরকালের ডাক শুনতে পাচ্ছ।

লোকটা তেমনি ভাবে হাঁপাতে থাকে মাথা নীচু করে। কথা বলতে পারে না।

লাল সিং বলে,—আমাকেই নামতে হবে নাকি?

লোকটি হাত উঠিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। তার বুকের পাঁজরগুলো হাপরের মত ওঠা নামা করতে থাকে।

লাল সিং অপেক্ষা করে। প্রশ্ন করে,—বাড়ি কতদূর?

লোকটি মাথা নীচু করেই আঙুল তুলে দেখায়। লাল সিং সেদিকে চেয়ে একটা কুঁড়ে ঘর মত দেখতে পায় কিছুটা দূরে।

—এখানে শুধু তোমারই বাড়ি? গ্রাম নেই?

এতক্ষণে লোকটা কথা বলে,—না। ওটা আমি তৈরী করেছি। দেখছ না কত ছোট?

—তাই দেখছি। দাও এবারে তুলে দাও তো।

লোকটা আস্তে আস্তে উঠে বোঝা তুলে লাল সিং-এর সামনে রাখে। তারপর তার মুখের দিকে দেখেই চমকে ওঠে,—আপনি?

লাল সিং হেসে বলে,—আমি খুব বিখ্যাত হয়ে পড়েছি এদিকে। যে ভাবে তোমাদের পেছনে লেগে থেকে বাড়িঘর ছাড়িয়েছিলাম। এখন তোমরা অন্তত স্বীকার করবে ভালই করেছিলাম।

লোকটি বলে,—সেকথা নয়। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। খুব রোগা হয়ে গিয়েছি না খেতে পেয়ে। নইলে চিনতেন। আপনি আমার অতিথি

হয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, অনেকেরই অতিথি হতে হয়েছিল।

—না না, এখানে নয়। চিতোরের বাড়িতে।

—তার মানে?

লাল সিং মুহূর্তে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটির দুহাত চেপে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলে,—লক্ষ্মী? লক্ষ্মী কোথায়? আপনার বোন?

বিস্মিত লোকটি কুঠিরখানি দেখিয়ে দেয়।

লাল সিং ঘোড়ায় চেপে বলে,—আপনাকে চিনতে পারিনি। ক্ষমা করবেন। আপনি ধীরে ধীরে আসুন। আপনার কষ্টের দিন শেষ হয়েছে।

লাল সিং যেন দেবতা। হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে লক্ষ্মীর সম্মুখে তার কাতর প্রার্থনা এড়াতে না পেরে। অনাহারে সে শীর্ণা। আনন্দ করার ক্ষমতাও তার নেই। কারণ তার চোখে জল আসে না। সে শুধু কাঁপতে থাকে। তারপর সামনেটা কেমন অন্ধকার হয়ে যায়।

একটু পরে জ্ঞান হলে আপন মনে বলে,—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। কি সুন্দর স্বপ্ন।

—স্বপ্ন নয় লক্ষ্মী।

—কে?

লক্ষ্মী দেখে, সত্যিই স্বপ্ন নয়। তার মাথা লাল সিং-এর বুকে. সত্যিই তাই। একটুও মথ্যে নয়।

এতক্ষণে সে তার অশ্রুপাতের ক্ষমতা পায়। অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে।

লাল সিং বলে,—লক্ষ্মী, আমি বলেছিলাম আসব। আজ এসেছি লক্ষ্মী। কেউ আর আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তুমি কেঁদোনা।

লাল সিং জানে না লক্ষ্মীর এই কান্না দুঃখের নয়। এই কান্না দুঃখকে নিংড়ে বার করে নেওয়া এক অনাস্বাদিত আনন্দের কান্না।